ঘরের কথা ও

যুগ সাহিত্য

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত

প্রকাশক—
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ,
শিশির পাবলিশিং হাউস
কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

...ণ দাসের লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

এক সময়ে যাঁহাদের কাছে সুখ দুঃখের কথা
না বলিলে হৃদয় জুড়াইত না,
তাপ-দগ্ধ জীবনের অকথিত
কথাগুলি সেই আমার স্বর্গীয়
পিতামাতাকে স্মরণ করিয়া
বলিয়া গেলাম।
তাঁহারা স্বর্গ হইতে তাঁহাদের প্রাণ-প্রিয়
পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করুন, এই
কামনা

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেঃ

ভূমিকা—একটা লিখিতে হয় বলিয়াই লিখিতেছি, নতুবা বক্তব্য বিশেষ কিছু নাই। দুইটি কথা বলিব, তাহা হইলেই পালা শেষ। এই পুস্তকে বহু লোক সম্পর্কে বহু কথা লিখিয়াছি, সাময়িক ভাবে ভাল মন্দের বিচার করিয়া গিয়াছি, কিন্তু আমার বিচার শক্তি অল্প, এজন্য ভ্রমবশতঃ যদি কাহারও মনে ব্যথা দিয়া থাকি, তাঁর কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; হয়ত অনেকবার ভ্রম হইয়াছে, যতবার হইয়াছে, ততবার আমি মাথা নোওয়াইয়া ত্রুটি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি; সর্ব্বাপেক্ষা আমার লিখিবার বিপদ গিয়াছে যেখানে আত্ম-প্রশংসার বাড়াবাড়ি হইয়াছে, সেই অপরাধের জন্য যদি চাবুক খাইতে হয়, তাহা আমার প্রাপ্য বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইব।

দ্বিতীয়তঃ, ছাপা ও বানানের ভুল এত হইয়াছে যে তাহা একবারে অমার্জ্জনীয়, একে ত আমি ৪০ বৎসর যাবৎ প্রুফ দেখিয়াও প্রুফ দেখা শিখিলাম না, ভুলগুলি আশ্চর্য্যরূপে আমার চোখ এড়াইয়া যায়। তারপর কাত্যায়নী প্রেসের অধ্যক্ষ মহাশয় পীড়িত থাকায়, সমস্ত প্রুফ আমাকে একা দেখিতে হইয়াছে, এবং অর্ডার দেওয়া প্রুফে যে সকল ভুল কাটিয়া দিয়াছি, ছাপা হইলে দেখিতে পাইয়াছি সেই ভুলের অনেকগুলি রহিয়া গিয়াছে। পাঠকগণ অবশ্য আমাকেই দায়ী করিবেন, এবং সেই দায়িত্ব অস্বীকার করার পথও আমি দেখিতেছি না। ১০৯ পৃষ্ঠায় প্রথম ছত্রে ১০এর জায়গায় ১৫ হওয়াতে যে মারাত্মক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, শত শত ভুলের মধ্যে সেই একটির উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

৭নং বিশ্বকোষ লেন বাগবাজার

কলিকাতা শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন

১লা বৈশাখ, ১৩২৯।

সূচীপত্র

নির্ঘণ্ট

অ

আ

ই

ঈ

উ

এ

(ও)

(ক)

জ

ঝ

ট

ড

ঢ

ত

দ

ধ

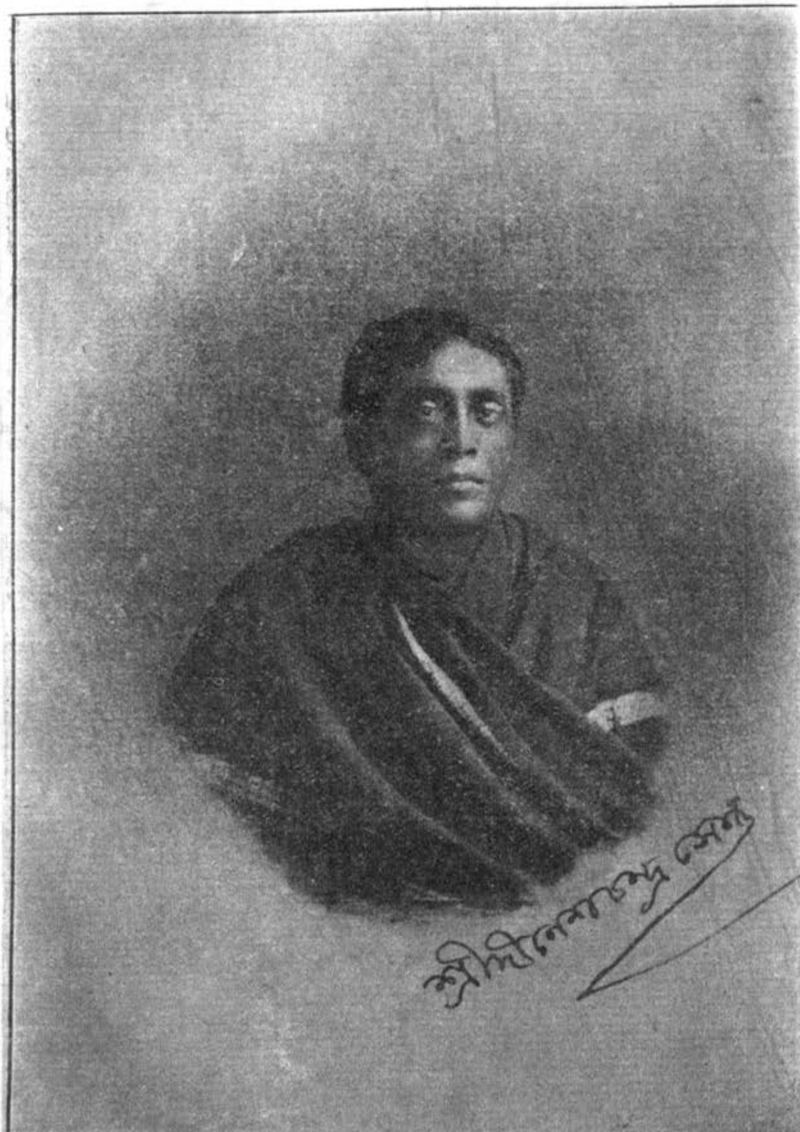
ন

ভ

(ম)

(র)

চিত্র-সূচী



গ্রন্থকারের ছবি, ১২ বৎসর পুর্ব্বেকার।

ঘরের কথা
ও যুগ-সাহিত্য

(১)

জ্যেষ্ঠ-পিতামহ রমানাথ সেনের অপমৃত্যু।

জয়দেবোক্ত পবনদূতের প্রসিদ্ধ কবি ধোয়ীর বংশে আমার জন্ম। একখানি প্রাচীন গীতগোবিন্দের টীকায় "ধোয়ী"—"ধূয়ী" বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন। এই "ধোয়ী" বা "ধূয়ী" কবিকে জয়দেব দুইটি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, একটি হইতেছে "শ্রুতিধর" আর একটি "কবিক্ষ্মা-পতি।" দ্বিতীয় বিশেষণটি দ্ব্যর্থবাচক, ইহাতে কবি যে রাজতুল্য বৈভব-শীল এবং ভূম্যধিকারী ছিলেন—তাহার প্রতি ইঙ্গিত আছে। পবনদূতে দৃষ্ট হয়, তিনি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের বন্ধু ছিলেন। হস্তী, স্বর্ণছত্র প্রভৃতি নানা মূল্যবান রাজযোগ্য উপহার দ্বারা লক্ষ্মণসেন ধোয়ী-কবিকে অভি-নন্দিত করিয়াছিলেন। বৈদ্যকুল-পঞ্জিকায় ভরতমল্লিক উল্লেখ করিয়াছেন যে এই "ধোয়ী" শুধু মহাকুলীন ছিলেন এমন নহে, তিনি পাণ্ডিত্য, অর্থ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতেও এত বড় ছিলেন যে সমস্ত শক্তি্রগোত্রের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ঐ গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিবিধ বীজপুরুষ ছিলেন,

কিন্তু প্রতিভা ও পদগৌরবে শ্রেষ্ঠ থাকায় শক্তিগোত্রীয় বৈদ্য-মাত্রেরই তিনিই "বীজী" বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। বৈদ্যকুল-পঞ্জিকাগুলিতেও ইঁহার নাম কোথায়ও "ধোয়ী" কোথাও "ধূয়ী" এবং কোথায়ও "দুহী" রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। চন্দ্রপ্রভায় এই তিন নামই দৃষ্ট হয়। রাঘব কৃত বৈদ্যকুল-পঞ্জিকায় দৃষ্ট হয়, ধোয়ীর পিতার নাম ছিল পুণ্ডরীক এবং পিতামহের নাম ছিল শ্রীবৎস।

ধোয়ীর দুই পুত্র, কাশী ও কুশলী। কুশলীসেনের পুত্র হিঙ্গুসেনকেই আমরা নিজেদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। রাঘব-কৃত পঞ্জিকায় লিখিত আছে, হিঙ্গুপুত্র অনন্তের উপাধি ছিল "ঠাকুর", সুতরাং এই সূত্রে আমাদের কৌলিক উপাধি "সেন ঠাকুর"। ধোয়ীর সন্তান-গণের মধ্যে হিঙ্গুই কৌলিন্যে মণ্ডিত হইয়াছিলেন। ধোয়ী মহাকুলীন হইলেও তাঁহার বংশের অপরাপর শাখা কতকটা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছেন। এখন আমরা আর নিজদিগকে ধোয়ীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেই না, হিঙ্গুর নামেই এখন আমাদের পরিচয়। কিন্তু এই শাখার যাঁহারা কুল রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহারা এখনও "ধোয়ী," "ধূয়ী" বা "দুহী'র সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়া থাকেন।

আমার প্রপিতামহ রাজচন্দ্রসেন মহাশয় হিঙ্গুবংশীয়দের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র খুলনা জেলার পয়োগ্রাম ছাড়িয়া ঢাকা জেলার সুয়াপুরগ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই গ্রামে আসিবার অব্যবহিত পরেই ৩৪ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। একান্ত নিঃসহায় অবস্থায় জ্ঞাতিগণের ষড়যন্ত্রে বিতাড়িত ও জমিদারীর অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়া রাজচন্দ্র সেনের পত্নী দুইটি শিশুপুত্র ও কন্যা লক্ষ্মীকে লইয়া পূর্ব্বোক্ত সুয়াপুর গ্রামে তাঁহার পিতা ভবানী প্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করেন।

বহু কষ্টে এই বিধবা রমণী তাঁহার পুত্রদ্বয় ও কন্যাকে লালনপালন করেন। কন্যাটি আবার বিবাহের অব্যবহিত পরেই বিধবা হন। দুই পুত্রের মধ্যে রমানাথ জ্যেষ্ঠ ও রঘুনাথ কনিষ্ঠ ছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই সংস্কৃত বাঙ্গালা ও পার্শীতে ব্যুৎপন্ন হন। রঘুনাথ সেন জাতীয় বৈদ্য-ব্যবসা অবলম্বন করেন, এবং তাহা ছাড়া বাড়ীতে মক্তব খুলিয়া ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা ও পার্শী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

রমানাথ সেন ছিলেন সেকালের পুলিশের দারোগা। কিন্তু পুলিশে কাজ করিলেও তাঁহার এমন অনেকগুলি গুণ ও প্রবৃত্তি ছিল, যাহা আদবেই পুলিশের কাজের সঙ্গে খাপ খাইত না। তিনি অতি সুদক্ষ চিত্রকর ছিলেন; ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার হস্তলিখিত "কামিনী-কুমার" পুঁথি বহুদিন আমাদের গৃহে ছিল; অক্ষরগুলি ঠিক মুক্তার মত, ও তাহার মধ্যে শুধু কালীতে আঁকা অনেকগুলি এমন সুন্দর চিত্র ছিল, যাহা দেখাইয়া এখনও আমি গৌরব করিতে পারিতাম। একখানায় কামিনী, পুরুষবেশে ঘোটকারূঢ় হইয়া স্বামীর অন্বেষণে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। সঙ্গে সখী, তিনিও পুরুষের ছদ্মবেশে অশ্বারোহণে চলিতেছেন। আর একখানায় পুরুষবেশী 'কামিনী' রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সঙ্গে মৃদঙ্গ, বীণা প্রভৃতি বাদ্যের সহ-যোগে সখী-কণ্ঠোদ্ভূত একতান সঙ্গীত শুনিতেছেন। এই সকল চিত্র আমার স্মৃতিপটে এখনও উজ্জ্বল রহিয়াছে। পুরুষবেশী কামিনীর গণ্ডদ্বয়ে যুবতী-সুলভ কমনীয়তা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; তাঁহার উষ্ণীষের কোমলতা যেন শাড়ীর শোভা আড়াল করিয়া রহিয়াছে; মধুর কোমল দেহযষ্টি অশ্বের বেগে যেন লতিকার ন্যায় কাঁপিতেছে। ঘোড়ার মুখের লাগাম তিনি কোমল করে ধরিয়া আছেন; সেইভাবে আকৃষ্ট হইয়া ঘোড়া মুখ বাঁকিয়া পায়ের খুরে অসহিষ্ণু গতি সূচনা করিয়া চলনোন্মুখ

হইয়া আছে। এই মহামূল্য পুঁথি খানি আমি বহু যত্নে রাখিয়াছিলাম,—১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লায় আমাদের বাসাবাড়ীতে আগুন লাগায় এত সাধের বইখানি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ত্রিশ বৎসরেও আমার সেই পুস্তক নষ্ট হওয়ার শোক কমিয়া যায় নাই। রমানাথ সেন মহাশয়ের স্ত্রী এবং আমাদের গ্রামের বৃদ্ধদের নিকট শুনিয়াছি রমানাথকৃত বহু সুরঞ্জিত চিত্র ঐ গ্রামের অনেকের বাড়ীতেই ছিল। আমি তাহার একখানিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কেবল তাঁহার হস্তলিখিত আমাদের একখানি কুল-পরিচয় ও বংশাবলী এখনও আমাদের নিকট আছে, সেই বংশাবলীর চারিদিকে তাঁহার চিত্রাঙ্কন নৈপুণ্যের একটু আভাস আছে।

রমানাথ চিত্র-বিদ্যা দ্বারা অবসর রঞ্জন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; তিনি নানারূপ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান দ্বারা নিজে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের প্রয়াসী ছিলেন। এই প্রচেষ্টাই তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের শীতকালে তিনি তাঁহার বন্ধু স্বগ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে গাজিখালী নদীর ধারে শব-সাধনা করিতে গিয়াছিলেন। রমানাথের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী গৌরমণি দেবী তখন অষ্টাদশ বর্ষীয়া। আমি তাঁহার নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহাই লিখিতেছি। রমানাথের বন্ধুর নাম মনে পড়িতেছে না, কিন্তু তাঁহার পুত্র শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আমি বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছি। গৌরমণি ঘটনাটী এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন:—

"তখন শীতকাল, কর্ত্তা (রমানাথ) তাঁহার বন্ধুর সঙ্গে সন্ধ্যাকালে বাহির হইয়া গেলেন। সেদিন শনিবার অমাবস্যা, কোথা হইতে দুইটী চণ্ডালের মৃতদেহ তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার উপর উপবিষ্ট হইয়া ইঁহারা সাধনা করিবেন।

"আমাদের বাড়ীতে তখন অনেক লোকজন; খাওয়া শেষ করিতে প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর হইত। সেইরাত্রি তখন দ্বিপ্রহরের কাছা-

কাছি ; বাড়ীর খাওয়া দাওয়া তখনও শেষ হয় নাই। আমি বাড়ীর বৌ, আমার খাওয়ার ডাক পড়ে নাই। আমি ঘোমটা টানিয়া উনুনের পাশে বসিয়া শীতকালের আগুন পোহাইতে ছিলাম। আমার বড়ই ঘুম পাইতেছিল, চক্ষে তন্দ্রা আসিয়াছিল। সেই তন্দ্রার ঘোরে স্পষ্ট দেখিলাম, একটা কালো বুড়ী আমার কাছে একটা থ'লে হাতে করিয়া আসিল এবং থ'লেটার মুখ খুলিয়া আমার মাথার উপর ঝাড়িতে লাগিল এবং বলিল—"আজ হ'তে পৃথিবীর যত দুঃখ তা' এই থ'লে শূন্য ক'রে তোর মাথায় দিয়ে গেলাম।"

"আমার তন্দ্রার ঘোর ছুটিয়া গেল। যেমনই চোখ মেলিয়া চাহিয়াছি, অমনই বাড়ীতে একটা ভয়ানক গোলমাল শুনিলাম, তারপর জানিলাম আমার কপাল পুড়িয়াছে। লোকজনেরা একটা বাঁশের দোলায় আমার স্বামীকে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছে। তিনি গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছেন, তাঁহার বামগণ্ডে ভয়ানক থাপরের দাগ, পাঁচটা আঙ্গুলের আঘাত যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে,—ঘাড়ের হাড় বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যেহেতু সমস্ত মুখখা'ন ডানদিকে বাঁকিয়া আছে।

"এই অবস্থায় তিনি তিন দিন জীবিত ছিলেন। ইহার মধ্যে মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ শব্দ করিয়াছেন, কোন জ্ঞান ছিল না, কোন কথা বলিতে পারেন নাই। সকলেই বলিল, শবের উপর বসিয়া জপ করিতেছিলেন—ভুতের চড়ে এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর পিতা ও তাহাই বলিলেন।" *

* এই ঘটনা সম্বন্ধে গ্রামের সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ মদীয় খুল্লতাত দেবীচরণ দাশ মহাশয় লিখিয়াছেন ,—"রমানাথ শ্মশান-ক্ষেত্রে চিতায় বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন, প্রকাশ আছে তিনি তপস্যায় স্খলিত হওয়ায়ই মৃত্যুর কারণ সংঘটিত হইয়াছিল।"

সাধ্বী গৌরমণি দেবী, সুদীর্ঘ বৈধব্য-জীবন কর্ত্তন করিয়া ১৮৯২ সনে ৭২ বর্ষ বয়সে কুমিল্লায় প্রাণত্যাগ করেন।

রমানাথ পুলিশের দারোগা ছিলেন—সুতরাং ভূতে মারিয়াছে কিংবা কেহ একাকী তাহাকে নির্জ্জন স্থানে সুবিধায় পাইয়া প্রাণান্তকর আঘাত করিয়া পালাইয়াছে—সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই, যদিও গ্রামের সকলেরই বিশ্বাস, ভূতের হাতেই তাঁহার প্রাণ গিয়াছে।

(২)

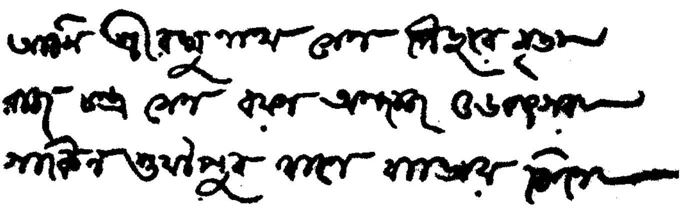
পিতামহ রঘুনাথ সেন।

রামনাথ সেন ছিলেন, আমার পিতামহ রঘুনাথ সেনের জ্যেষ্ঠ সহোদর।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি পিতামহ এদিকে কবিরাজী করিতেন, আর তা ছাড়া বাড়ীতে একটি মক্তব খুলিয়াছিলেন। ইহাঁরা দুই ভ্রাতাই যৌবনের অনেকটা মাতামহ ভবানীপ্রসাদ দাশের বাড়ীতে কাটাইয়াছিলেন এখনও সুয়াপুর গ্রামে উক্ত দাশ মহাশয়ের বাড়ীর উত্তরে ৮।১০ কাঠা জমি খালি পড়িয়া আছে; ঐখানেই কয়েকখানি ঘর তুলিয়া রামনাথ-রঘুনাথ, তাহাদের মাতা ও বিধবা ভগিনী সহ বাস করিতেন। সেখানে একটি দেবদারুগাছ আমরা শৈশবে দেখিয়াছি, তাহা আমার পিতামহ রঘুনাথ সেনের হস্ত-রোপিত ছিল।

কিন্তু রমানাথ সেনের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে ইহাঁরা ঐ গ্রামের ভিন্ন স্থানে বাড়ী করিবার সংকল্প করিলেন। সুয়াপুর গ্রামের যে প্রান্তে ইতিহাস-বিশ্রুত বাজাসনের ভিটা এখনও বর্ষায় বন্যাপ্লাবিত সমস্ত পারিপার্শ্বিক ভূখণ্ডের মধ্যে মাথা জাগাইয়া থাকে—যে ভিটা খনন করিয়া মৃন্ময় বুদ্ধ-মূর্ত্তি ও প্রাচীন অট্টালিকার ভিত্তি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই বাজা-সনের পশ্চিমে ও সুয়াপুরের পূর্ব্ব সীমান্তে ৯।১০ বিঘা পরিমিত ভূমির মৌরসী সত্ব লাভ করিয়া রমানাথ-রঘুনাথ স্বীয় আবাস নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করেন।

উভয় ভ্রাতাই খেয়ালী ছিলেন। রমানাথের খেয়াল ছিল চিত্র-বিদ্যা ও যোগসাধন। রঘুনাথের খেয়ালের মাত্রা আর একটু বেশী ছিল, বৃক্ষ রোপণই তাঁহার জীবনের সর্ব্ব প্রধান ব্রত ছিল। পূর্ব্বোক্ত ৯।১০ বিঘা ছিল একটি চতুষ্কোণ জমি। এই জমির চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া তিনি আম্র-বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। আমাদের সে অঞ্চলে নেংড়া, ফজলী, বোম্বাই প্রায় কোথাও দেখা যাইত না। রঘুনাথ দূর হইতে সেই সকল আমের কলম আনিয়া এই বৃক্ষ-বাটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রোপিত আমগাছের সংখ্যা প্রায় ৪০০ শত ছিল; আমগাছের নীচে সেই বাটিকার চারিদিক বেষ্টন করিয়া তিনি গড়খাই করিয়াছিলেন, তাহা বর্ষায় জলে ভরিয়া যাইত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠমাসে আমাদের বাড়ীর যে শোভা হইত, তাহা একটা বিশাল চিত্র-পটের ন্যায় আমার স্মৃতিতে দেদীপ্যমান আছে। সিন্দুর, হলুদ, কালো, কত রকম বর্ণের সহস্র সহস্র আম শাখায় শাখায় দুলিতে থাকিত। ঝড় হইলে সেই গড়খাইএর মধ্যে সেগুলি ঝরিয়া পড়িত—সেই দৃশ্য দেখিয়া আমার বাল্মীকির "অনেকবর্ণম্ পবনাবধূতম্, ভূমৌ শতন্ত্যাম্রফলম্ বিপক্বম্।" (সুন্দর) শ্লোক মনে পড়িত। বাড়ীর উত্তরদিকে একটি উৎকৃষ্ট বোম্বাই আমের এবং পশ্চিমে, কয়েকটি সিন্দুরে ও কজলির গাছ ছিল; পড়ন্ত সূর্য্যের আলো জ্যৈষ্ঠমাসে সেই সিন্দুরে আমের উপরে পড়িলে কি সুন্দর দেখাইত! এমন গাছ ছিল না যাহার শাখায় চড়িয়া আমি কখনও প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া—আম না পাড়িয়াছি, এমন শাখা ছিল না, যাহার সঙ্গে আমার আনন্দ, চাঞ্চল্য, ও মৃত্যুভয়ের কোন না কোন স্মৃতি জড়িত না ছিল। যখন ঝড় হইত, তখন বৃক্ষতলে শত শত আম পড়িয়া সেই সুদীর্ঘ পরিখা পূর্ণ করিয়া ফেলিত। সুত্রাপুরের ত কথাই নাই, নান্না, যৌওয়া প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে ও সেই ঝড়ের



পিতামহ রঘুনাথ সেনের হস্তলিপি,—তাং ১৩ই কার্ত্তিক,
১২৬২, বাং সন।

সময় বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সিক্তবস্ত্রে গা ঢাকিয়া মেয়ে-পুরুষেরা থলিয়া ভরিয়া আম কুড়াইয়া লইয়া যাইত। আমাদের অঞ্চলে কোন ভদ্রলোক আম বিক্রয় করিতেন না। আমরা অধিকাংশ আম গ্রামে বিলাইয়া দিতাম। সুতরাং যাহারা আম কুড়াইত বা গাছে চড়িয়া পাড়িত, আমরা তাহাদিগকে বাধা দিতাম না। কেবল ফজলী ও বোম্বাই গাছে কাহাকে চড়িয়া আম পাড়িতে দেখিলে বারণ করিতাম।

সেই সকল দিনের স্মৃতি আমার কাছে মধুময়। আমার ভগিনীরা খোলা চুলে অসম্বৃত বস্ত্রে বিপুল উৎসাহে আম কুড়াইয়া উঠান ভর্ত্তি করিত। তাহাদের সর্দ্দার ছিল কর্পূরাদিদি। সে আমাদের বাড়ীর পরিচারিকা হইলেও আমরা তাহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিয়াই জানিতাম। কোথায় ছিল তখন ম্যালেরিয়া-প্লীহা-লিভার,—রেলগাড়ীতে চড়িয়া এই সকল পীড়া এদেশে আসিয়াছে। আমাদের শৈশবাবস্থায় ইহারা মুয়াপুরের ধারে কাছেও উঁকি মারিত না। কত যে জল ঝড় সহিয়া আমরা আম কুড়াইয়াছি,—কত ভেজা কাপড় যে গায় শুকাইয়াছে—ঘন ঘটাচ্ছন্ন আকাশে সূর্য্যের সঙ্গে অনেক সময় সাক্ষাৎ হইত না, দীর্ঘকেশী ভগিনীদের ভেজা চুলে বালিস আর্দ্র হইয়া থাকিত। কই, কাহার ত কখনও মাথাটি ধরিতে দেখি নাই। আজ ছেলেদের ছাতামাথায় সত্ত্বেও যদি বর্ষার জলবিন্দু দুই ফোটা মাথায় পড়ে, তাহা হইলেইত ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিমুনিয়ার আশঙ্কায় আমরা অস্থির হইয়া পড়ি। এখন ছেলেরা ব্যারামের ভয়ে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ভগবানের দান রৌদ্রবৃষ্টিকে জুজুর মত ভয় করে!

এখনও বর্ষাকালে দেখিতে পাই, বৃক্ষের শাখায় বসিয়া পক্ষিকুল বর্ষার জলে ভিজিয়া ভিজিয়া পক্ষপুট হইতে জল ঝাড়িতেছে। আমরা যে শৈশবে সেই রকম করিয়া বর্ষার অজস্র জল শরীর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া

মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতাম। বাড়ীতে আসিলে মা খিচুড়ী ও দশ রকম ভাজা রাঁধিয়া দিতেন। আমাদের পল্লী-লক্ষ্মী এখন অন্তর্হিত হইয়াছেন, আমাদের বাড়ীর 'সিন্দুরে' আমে তাঁহার কপালের যে সিন্দুর-রাগ ফলিয়া উঠিত, সেই কি তাহার শেষ চিহ্ন দেখিয়াছিলাম!

আমি পিতামহের কথা ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। তিনি এই চারি শত আমগাছের প্রত্যেকটি নিজ হাতে রোপণ করিয়াছিলেন। ভক্ত যেরূপ নিজহস্তে মন্দিরটি সাফ্ করেন, অপরকে সে কাজ করিতে দেন না,—পিতামহ সেইরূপ গাছের কাজ মজুর দিয়া করিতে দিতেন না। কেমন করিয়া মাটি গুড়ো করিতে হইবে, কতটুকু জল দিতে হইবে, সূর্য্যের কিরণ প্রখররূপে আসিয়া পড়িলে গাছের কোন দিকটায় একটু ঢাকা দিতে হইবে—এসকল বিষয়ের সূক্ষ্মবিচার তাঁহার ছিল। যদি মজুরেরা সেই কাজ করিত, তাহারা দুদিনের মধ্যে মারপিট খাইয়া পলাইয়া যাইত, কারণ এই ব্যাপারটিতে পানের থেকে চুণ খসিলে আর রক্ষা ছিল না। এই জন্য অপরে ঐ কাজ করিলে তিনি তৃপ্তি পাইতেন না, এবং তাঁহার মনের মত কাজ করিতে গেলে বহু ত্রুটি থাকিয়া যাইত। তিনি গৃহের নিকটে কমলানেবুর চারা ও গোলাপ জাম, পেয়ারা প্রভৃতি রোপণ করিয়াছিলেন, সারি সারি গুবাকপংক্তি প্রহরীর ন্যায় বাড়ীর ধারে ধারে দণ্ডায়মান থাকিত। এমন বৃক্ষ ছিল না, যাহা আমাদের এই বৃক্ষ-বাটিকাকে শোভাসৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে নাই।

এই বৃক্ষগুলির উপর পিতামহের যে যত্ন ছিল, সদ্যোজাত শিশুর উপর তাহার মাতার ততোধিক যত্ন থাকে না। একদা তিনি মৃৎ-পাত্রে কমলানেবুর ছোট চারা পুতিয়া রৌদ্রের দিকে রাখিয়া দিয়াছিলেন,

ইচ্ছা ছিল, সেগুলি একটু বড় হইলে যথা স্থানে লাগাইবেন। আমাদের বাড়ীতে লক্ষ্মী নাম্নী এক পরিচারিকা ছিল, সে ছোট বেলা আমাকে "মানুষ" করিয়াছিল। সেই দাসী ঐ কমলানেবুর চারা-সম্বলিত মৃদ্‌ভাণ্ডগুলির উপর কাপড় শুকাইতে দিয়াছিল,—তখন পিতামহ বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, আসিয়া যখন ঐ দৃশ্য দেখিলেন, তখন তিনি ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইলেন। তাঁহার একখানি খড়্গ ছিল, উহা সুতীক্ষ্ণ ও সুদীর্ঘ, উহার নাম "রামদা"। এই "রামদা" খানি হাতে করিয়া তিনি লক্ষ্মীকে কাটিয়া ফেলিতে ছুটিয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বে অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া পিতামহ এমনই চোট পাইয়াছিলেন যে প্রৌঢ় বয়সে তাঁহার একটী পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছিল। এই পঙ্গুত্বই লক্ষ্মীর প্রাণ-রক্ষার হেতু হইয়াছিল। লক্ষ্মীর পশ্চাতে পশ্চাতে "রামদা" হস্তে ছুটিয়া তিনি আমাদের বৃক্ষবাটিকা কয়েকবার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, তারপর একটি বলিষ্ঠ লোক লক্ষ্মীকে তুলিয়া লইয়া খুব দ্রুতবেগে অন্যত্র চলিয়া গেল। পিতামহ খড়্গ হাত হইতে ফেলিয়া নিজ গৃহে বসিয়া উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ও চোখের জল ফেলিয়া নিজের ক্রোধ উড়াইয়া—ভাসাইয়া দিলেন।

আমি আর একদিন তাঁহার এই উন্মত্ত ক্রোধ স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তখন আমার বয়স সাত। কে যেন কোন্ গাছের উপর কি অত্যাচার করিয়াছিল,—পিতামহ তাঁহার "রামদা" হস্তে করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটি-লেন এবং আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে এক সার (প্রায় ১৫।১৬টা) সুপুরী গাছ ছিল, এক এক চোটে এক একটি গাছ কাটিয়া যখন শেষ গাছটার উপর আঘাত পড়িল, তখন আমাদের ভৃত্য জগা-গয়লা যাইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া হাত হইতে খড়্গ ছাড়াইয়া লইল। সেদিনও দেখিলাম তিনি জগার কাঁধে মুখ লুকাইয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতে-

ছেন।* আমাদের পরিবারে কেহ রাগ করিলে তাহাকে রঘুনাথ সেনের সঙ্গে তুলনা করা হইত—বস্তুতঃ তাঁহার ক্রোধপ্রবণ স্বভাব আমাদের পরিবারে প্রবাদ বাক্যের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আমাদের সেই বৃক্ষ-বাটিকার কথা আর কি বলিব? আমার মানসপটের উজ্জ্বলতম চিত্র—সেই সকল বৃক্ষের পাতায় পাতায় শিশির বিন্দু মুক্তার মতন দেখাইত। সূর্য্যের কিরণ কত রং দিয়া তাহা সাজাইত! রাত্রির আঁধারে যাহা জীবনের অব্যক্ত প্রহেলিকার মত গাঢ় ভাবে আমার কল্পনাকে প্রবুদ্ধ করিত, দিনের বেলায় তাহা ফুল-ফল লইয়া হাসিয়া উঠিত, সেই আম্রবাটিকার উপর ১৮১৯ সনের নিদারুণ শারদীয় ঝড় প্রবাহিত হইয়া—আমার পিতামহের স্নেহ-অধ্যবসায়ের সেই অপূর্ব্বকীর্ত্তি উৎপাটিত করিয়া লইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাকালে যখন নান্নারের মাঠে বেড়াইয়া বাড়ীতে ফিরিতাম, তখন দেখিতাম, সূর্য্যাস্তের আলোকে পক্ষপুট মণ্ডিত করিয়া অসংখ্য পাখী কলরব করিতে করিতে আমাদের বাড়ীর পশ্চিমদিগের সুবৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষটির উপর আসিয়া পড়িতেছে। কখনও দেখিতাম আমাদের পুকুর-পাড়ের কালো জামগাছে শত শত ফল ফলিয়া আছে, তখন বাল্মীকির সেই "অঙ্গার চূর্ণোৎকর সন্নিকাশৈঃ ফলৈঃ সুপর্য্যাপ্ত রসৈঃ সমৃদ্ধৈঃ॥ জম্বু দ্রুমাণাং প্রবিভান্তি শাখাঃ। নিপীয়মানা ইব ষট্‌পদৌঘৈঃ।" শ্লোকটী মনে পড়িয়াছে।

* দেবীচরণ দাশ মহাশয় লিখিয়াছেন, "রঘুনাথ একজন উৎকৃষ্ট শিকারী ছিলেন, তিনি প্রায়ই সজারু প্রভৃতি শিকার করিয়া আনিতেন, একদিন অভয়শঙ্কর সেনের বাড়ীর একটা বাতাবি বৃক্ষের শাখায় জড়ানো একটা প্রকাণ্ড ময়াল সাপকে তিনি গুলীর আঘাতে মারিয়াছিলেন, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম।"

আমার পিতামহের আর এক খেয়াল ছিল ঘুড়ি-উড়ানো। শুনিয়াছি প্রকাণ্ড 'চিলে'ঘুড়ি তৈরী করিয়া তিনি গুপ্তদের বাড়ীর বাবুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া ঘুড়ি উড়াইতেন। উভয় দলে বহুসংখ্যক লোক এই প্রতিযোগিতায় এ পক্ষ ওপক্ষের সহায়তা করিয়া দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিতেন। ঘুড়ির সূতো তৈরী করিতে নাকি ধূনো, কাঁচের টুকরা প্রভৃতি অনেক মাল-মসলা বহুদিন ধরিয়া খরচ হইত। সেই সূতো খুব মোটা ও শাণিত তরাবারীর ন্যায় সুতীক্ষ্ণ হইত। ঘুড়িগুলিও এক একটা মানুষের মত উঁচু হইত। এই প্রকাণ্ডাকৃতি ঘুড়ি কোনটি চিলের মত, কোনটি সর্পাকৃতি, কোনটি বা ঠিক মানুষের মূর্ত্তির মতই নির্ম্মাণ করা হইত, সেই ঘুড়ির শব্দ এখনকার এরিওপ্লানের শব্দের মতই ভোঁ ভোঁ শব্দে গগনমণ্ডল আলোড়িত করিয়া উড়িয়া চলিত। গুপ্তপাড়ার ঘুড়িগুলিও পিতামহের ঘুড়িগুলি দুই প্রতিপক্ষীয় সৈন্যের ন্যায় আকাশের উপর যুদ্ধ করিত, যাহাদের ঘুড়ি কর্ত্তিত হইয়া স্খলিত নক্ষত্রের ন্যায় আকাশ হইতে হেঁটমুণ্ডে ভূতলে পতিত হইত, তাঁহাদের ক্ষোভের সীমা থাকিত না—এবং অপর পক্ষের জয় জয়কার শব্দে পাড়া প্রতিশব্দিত হইত।

ইহা ছাড়া ঘোটকারোহণের কৃতিত্বও প্রতিদ্বন্দ্বিতার অপর এক বিষয় ছিল। আমি শিশুকালে আমাদের একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক বোঝাই অস্ত্র শস্ত্র দেখিয়াছি। তাহা অনেক রকমের ছিল, কোনটি ব্যাঘ্র নখের ন্যায়, কোনটি শূলাকৃতি, কোনটি বল্লম, কোনটি বৃহৎ চক্ষু বিশিষ্ট ২½ ফিট লম্বা খড়্গা, ইহা ছাড়া পিতামহের প্রিয় "রামদাটি" ত ছিলই। শুনিয়াছি আমাদের ও অঞ্চলে প্রায়ই ডাকাতি হইত, তখন গ্রামের লোকরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া ডাকাতের সম্মুখীন হইতেন। বাজাসনের ভিটার নিকটে নাকি দস্যুদলের সঙ্গে গ্রামবাসীদের একবার একটা সম্মুখ সমর হইয়া গিয়াছিল, গ্রামের দলের নেতা ছিলেন আমার পিতামহ।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে পিতামহ একেবারে উদাসীন ছিলেন। বোধ হয় ধর্ম্ম করিতে যাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শোচনীয় ভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার পর হইতে পিতামহের ধর্ম্মের প্রতি একটা বিদ্বেষ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। শুনিয়াছি আমাদের কুলগুরু একবার আমাদের বাড়ীতে পদ-ধূলি দিয়াছিলেন। পিতামহ ঠাকুর তাঁহাকে লগুড় লইয়া তাড়া করিয়াছিলেন। তদবধি আমাদের ইষ্টদেবতারা আর কেহ আমাদের বাড়ীর ত্রিসীমা মাড়ান নাই।

আমার পিতা যখন একান্ত শিশু, তখন আমার পিতামহীর মৃত্যু হয়। আমাদের বাড়ীতে একটি কোচ জাতীয় পরিচারিকা ছিল, তাহার নাম করুণা। যৌবনে সে রূপবতী ছিল—তাহার চোখ দুটি নাকি বড় সুন্দর ছিল। পিতামহ তাহাকে একটা বাড়ী করিয়া দেন। এখন অভয়শঙ্কর সেন মহাশয়ের বাড়ীর পশ্চিমে কালাচাঁদ সিংহের কন্যা কাশী যে জায়গাটা দখল করিয়া আছে, সেইখানে করুণার বাড়ী ছিল। এই করুণাও একটি অদ্ভুত রকমের জীব ছিল। আমি যখন ইহাকে দেখিয়াছি, তখন করুণা বিগত-যৌবন লোলচর্ম্মা বৃদ্ধা। আমি স্কুলে যাইবার পথে ইহার বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতাম। আমার মাতা আমাকে সর্ব্বদা মানা করিয়া দিতেন, "তুই ঐ বুড়ীর বাড়ীতে কিছুতেই যাস্ না, এবং সে কিছু খেতে দিলে খাস্ না।" কিন্তু আমি ঐ পথ দিয়া যাওয়ার সময়, করুণা এমনই বিনয় সহকারে ক্লেশ জানাইয়া আমাকে অনুনয় করিতে থাকিত, যে আমি কিছুতেই তাহার অনুরোধ এড়াইতে পারিতাম না। আমি তাহার বাড়ীতে গেলে সে যেন হাতে হাতে স্বর্গ পাইয়াছে, এরূপ বোধ হইত। তখন আমার বয়স পাঁচ কি ছয়;—করুণা উৎকৃষ্ট চিড়ে, ক্ষীর, চাটিম কলা, ভাল দুধের সর, মাখন, ভাল আখি গুড় ও কদমা-তিলে প্রভৃতি আমাকে খাইতে দিত। সেই বয়সে কোন্ শিশু এরূপ লোভনীয়

দান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছে ? আমি মাতার নিষেধ ভুলিয়া যাইতাম, এবং দুই একবার "না, আমার ক্ষিধে নাই, পেটের অসুখ" প্রভৃতি মিথ্যা ওজুহাত দিয়া শেষে সেই উপাদেয় খাদ্য গুলির প্রতি সদ্বিচার করিতে লাগিয়া যাইতাম। করুণা আমাকে খাওয়াইয়া যে কি তৃপ্তিলাভ করিত, আমি একজন লেখকাভিমানী হইলেও তাহা বর্ণনা করিত আমার সাধ্য নাই।

করুণার একটি ঘর বহুবিধ মাটীর দেবদেবী-মূর্ত্তিতে পূর্ণ ছিল। ইন্দ্র, যম, ব্রহ্মা, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি দেবতার সুবৃহৎ মূর্ত্তি সে নিজে বিবিধ উপাচারে পূজা করিত। পূজা করিবার সময় যে তসর পরিত। তাহা ছাড়া তাহার বাড়ীর নিকট একটা অতি প্রাচীন পুকুর হইতে একখানি প্রস্তর নির্ম্মিত বাসুদেব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, সেটিও তাহার দেব-পংক্তিতে স্থান পাইয়াছিল। সে কোনো মূর্ত্তি পাইলে মাটী খুঁড়িয়া সাবধানে আবৃত করিয়া তাহা বৃক্ষতলে পুঁতিয়া রাখিত এবং একদিন ঘুম হইতে জাগিয়া বলিত যে সে স্বপ্ন দেখিয়াছে যেন অমুক দেবতা তাহার বাড়ীর কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে ভূনিম্নে থাকিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইতে আদেশ করিয়াছেন। এইভাবে মূর্ত্তিখানি সে তুলিয়া খুব আড়ম্বরের সহিত পূজা করিত। ছোট লোকদের মধ্যে তাহার ভক্তের অভাব ছিল না।

আমার পিতামহের মৃত্যুর পর সে যে কয়েক বৎসর বাঁচিয়াছিল, তখন তাহার এই পূজার ঝোঁকটা তাহাকে একটা নেশার মত পাইয়া বসিয়াছিল। বয়স তখন তাহার সত্তর। শীর্ণ দেহ, লোল চর্ম্ম, স্খলিত দন্ত। তাহার বর্ণটা হয় ত এককালে ফর্সা ছিল, কিন্তু শেষটা এমন দাঁড়াইয়াছিল যে উহা শ্যাম কি গৌর তাহা বোঝা যাইত না। কোন কোন সন্ধ্যায় যেমন দিবালোক ও আঁধার মিশিয়া যাইয়া একটা

ঘোলাটে রঙে দাঁড়ায়—তার রঙটা সেই রূপ হইয়া গিয়াছিল। চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবপূজা উপলক্ষে সে ধুনচি হাতে বহু লোক পরিবৃত হইয়া মাথা দোলাইতে দোলাইতে ছুটিতে থাকিত। ধুনচি হইতে ধুনোর ধোঁয়াতে তাহার এলোচুলেও মুখ ঢাকিয়া গিয়া তাহাকে একটা কবন্ধের মত দেখাইত। বহু লোক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইত। তাহার মাথার ঝাঁকুনি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিত, তারপর একটা জায়গায় সে বসিয়া পড়িয়া যাইত। হাতের ধুনচিটা তখনও ছাড়িত না। কিন্তু একরাশ পাকা চুল শুদ্ধ মাথাটা এরূপভাবে ডাইনে বামে ঝাঁকিতে থাকিত যে, মনে হত ব্যাটের তাড়া খাইয়া বলটা একবার এদিকে তারপর অপরদিকে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। ইহার কিছু পরেই সে মুখে ফেনা তুলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িত। আমাদের দেশে একে "বাইল পড়া' বলে। আওয়ারউড সাহেব 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকাতে এই 'বাইল পড়া", যাহা খ্রীষ্টানদের কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল, তাহা বৈষ্ণবের "দশা"র পড়ার সঙ্গে গোল করিয়াছেন। কিন্তু "বাইল পড়া" ও "দশায় পড়া" দুই ভিন্ন বস্তু। একটা হচ্ছে বর্ব্বরদের শারীরিক প্রক্রিয়ার উৎপন্ন উত্তেজনার ফল; অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে উহা দেখা যায়, আর বৈষ্ণবের "দশায় পড়া"—অষ্ট সাত্বিক বিকারের ফল। বৈষ্ণবেরা ইহার বৈজ্ঞানিক প্রণালী তাঁহাদের ভক্তি গ্রন্থে সম্যক আলোচনা করিয়াছেন; এবং দশার প্রণালী বদ্ধ নানারূপ সূক্ষ্মভেদ আবিষ্কার করিয়া উহাকে সাধনার অঙ্গীয় করিয়াছেন।

করুণা এই সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ছোট লোকের মধ্যে একটা ভাল রকমের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিয়াছিল। এমন কি শুনিয়াছি, এই বৃদ্ধ বয়সে সে গাছের উপর সন্ধ্যাকালে চড়িয়া পাতার আড়ালে লুকাইয়া থাকিত, এবং বিস্ময়াপন্ন ও ভীত পথিককে নানারূপ দৈববাণী শুনাইয়া

তাহার আবাস স্থলটিকে একটা সিদ্ধ পীঠে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা করিত। দেবীচরণদাস মহাশয় ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইতর লোকের নিকট করুণার খুব প্রতিপত্তি ছিল। হরি জেলে ইহার প্রধান শিষ্য হয়, তাহার প্রযোচনায় অনেক ইতর লোক ইহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিত। এমন কি গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার সবজজ কালীকিঙ্কর রায় মহাশয়ের বন্ধ্যা স্ত্রী অপত্য-কামনায় করুণার দেবদেবীর নিকট মহিষ বলি মানত্ করিয়া পূজা দিয়াছিলেন।"

কিন্তু করুণার এই সমস্ত বীভৎস আচারের মধ্যে প্রেমপিপাসু বাল-বিধবার সন্তপ্ত হৃদয়ের হাহাকারের পরিণতি আমার নিকট এখন দীপ্যমান হইতেছে,—সেই প্রেম-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য সে যৌবনে আমার পিতামহের পক্ষপাতী হইয়াছিল এবং সেই হৃদয়ের ক্ষুধার খাদ্যস্বরূপ—নানারূপ দেবতার পূজা করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাহার মাতৃত্বের লোভ ফুটিয়া উঠিত, আমাকে খাওয়াইতে বসিয়া। তখন তাহার যে আনন্দ দেখিয়াছি—তাহা তাহার সর্ব্বপ্রকার বীভৎসতাকে ঢাকিয়া আমার নিকট তাহার অপূর্ব্ব অন্নপূর্ণামূর্ত্তি প্রকট করিয়া দেখাইত। প্রেম মানুষকে ভুলাইয়া শেষে কোন্ কূপে নিক্ষেপ করিতে পারে—করুণার জীবন আমার কাছে তাহারই নিদর্শন। তাহার গৃহত্যাগকে আমি কখনই কামুকতার প্রেরণায় ফল মনে করি নাই; সে প্রাণের ক্ষুধা লইয়াই বিপথে বাহির হইয়াছিল।

করুণার মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত ঠাকুর দেবতা আমি লইয়া আসিয়াছিলাম। যমরাজের মূর্ত্তিটিকে ফেলিয়া দিয়া আমি তাঁহার প্রকাণ্ড মহিষটার উপর চড়িয়া বসিয়াছিলাম। সেই ক্রোধেই বোধ হয় যমরাজ এখন আমার দিকে রক্ত-চক্ষে দৃষ্টি করিতেছেন। কয়েকদিনের জন্য এই ভাবে ইন্দ্রকে পদচ্যুত করিয়া আমি তাহার ঐরাবতকে দখল করিয়া

লইয়াছিলাম। ৮।১০ দিনের মধ্যে কয়ণা-পূজিত বহু দেবদেবীর মূর্ত্তিকে আমি এই ভাবে বিড়ম্বিত করিয়াছিলাম। বোধ হয়, কালাপাহাড়ের পরে ইংরেজী আমলে এরূপ আর কেহ করে নাই। কিন্তু সেই প্রস্তর-নির্ম্মিত বাসুদেব মূর্ত্তিটিকে যে আমি কত যত্নে পূজা করিতাম, এবং তাহার চাল-চিত্রের ছাপ লইয়া মাটী দিয়া কত প্রতিমূর্ত্তি গড়িতাম, তাহা আর কি বলিব! আমি যখন সুয়াপুর ছাড়িয়া হবিগঞ্জ চলিয়া যাই, তখন রোয়াইল গ্রামবাসী একজন ব্রাহ্মণ-চোর এই মূর্ত্তি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং এই অপহৃত বিগ্রহকে পূজা করিয়া পুণ্য অর্জ্জনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বাসুদেব তাঁহার পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা আমি সেই দেবতার দর্শন পাইলে জিজ্ঞাসা করিতাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার পিতামহের এক বিধবা ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল লক্ষ্মী দেবী। তাঁহাকে আমরা 'কালোঠাকুর মা' বলিয়া জানিতাম। তিনি বোধ হয় কালো ছিলেন, এই জন্যই তাঁহার ঐ নাম হইয়াছিল। এই বিধবা ভগিনীর সঙ্গে পিতামহের একবারেই সদ্ভাব ছিল না,—শুনিয়াছি, উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ ছিল না। 'কালো ঠাকুর মা' পিতামহকে 'কালাপাহাড়' উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার পিতামহ কালো ছিলেন না।

আমার মাতা বড় মানুষের মেয়ে ছিলেন—সে কথা পরে লিখিব। শুনিয়াছি, পিতামহের নানারূপ কার্য্যকলাপে আমার পিতা বিরক্ত ছিলেন এবং আমার মাতাও নাকি তাঁর প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন না। বহুকাল পর্য্যন্ত পিতামহ শয়ন-ঘরে স্বয়ং রাঁধিয়া খাইতেন। আমি দেখিয়াছি, তিনি নিজের বাজার নিজে করিয়া বেলা একটার সময় উনুনে আগুন ধরাইতেছেন। দোষ যে পক্ষেরই থাকুক না কেন, তিনি যে একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূর সেবায় বঞ্চিত হইয়া বৃদ্ধ বয়সে কষ্ট পাইতেন—

তাহার সন্দেহ ছিল না। তিনি তেজস্বী ছিলেন, এজন্য অনিচ্ছা বা অবহেলাকৃত সেবা গ্রহণে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু তিনি কখনও তাঁহার পুত্র বা পুত্রবধূর নিন্দা কাহারও নিকট করেন নাই; গার্হস্থ্য-জীবনের অশান্তি তাহার বুকে চাপিয়াছিল, কিন্তু মুখে ফুটিত না। একান্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তিরাও তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নীরব হইয়া যাইতেন।

বহু দোষ ও গুণ লইয়া তিনি যেদিন এই সংসার হইতে বিদায় লইলেন, সে দিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখন আমার বয়স সাত কি আট। শীতকালের প্রত্যূষ, বোধ হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইবে। জগা-গয়লা (আমাদের চাকর) উৎকণ্ঠিতভাবে আসিয়া বাবাকে চীৎকার করিয়া ঘুম হইতে জাগাইল। আমরাও লেপের মুড়ি দিয়া জাগিয়া বসিলাম। সংবাদটি এই, পিতামহ অতি প্রত্যূষে (প্রভাতের বহু পূর্ব্বে) উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিতেন। সেদিনও সেইরূপ যথারীতি মুখ ধাবণাদি সারিয়া নিজ গৃহে ঢুকিতেছেন, এমন সময় কাঁপিতে লাগিলেন এবং দুই এক মিনিট পরেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আমার মনে আছে, বাবা এই সংবাদ শুনিয়া অসম্বৃত বস্ত্রে উঠিয়া বাহির হইলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। কামিনীফুলের একটা গাছের নীচে তিনি শায়িত, তাঁহার পাদমূল হইতে অনতিদূরে, তাঁহার সখের কমলালেবুর গাছটি। জ্ঞান নাই, চক্ষে পলক নাই। সংবাদ পাইয়া অতি দ্রুত গ্রামের বহু লোকজন তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-জমিদার বৃদ্ধ তারিণীপ্রসাদ রায় এবং আমাদের আত্মীয় পরম শ্রদ্ধেয় ভারতচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়। ভারত দাস মহাশয়ের হাতে স্বত-কমল। কায়স্থ কবিরাজ দ্বারকনাথ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পিতামহের প্রাণ পূর্ব্বেই বহির্গত হইয়া গিয়াছে, স্বতকমল, লক্ষ্মীবিলাস ও স্বর্ণ সিন্দুরে কি করিবে?

পূর্ব্বের দিনও তিনি নিজে বাজার করিয়া নিজ হাতের রান্না খাইয়াছিলেন, একটি দিন রোগশয্যায় পড়িয়া সেবার ভিখারী হইলেন না। তেজস্বী সন্ন্যাসীকল্প বৃদ্ধ সন্ন্যাস রোগে আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এখনও মনে পড়ে, তাঁহাকে আমি কত বিরক্ত করিয়াছি। তাঁহার ঘরে সরু সরু বাঁশের চোঙ্গায় নানারূপ কবিরাজী ঔষধ থাকিত, তালা খুলিয়া ঘরে ঢুকিলেই আমি তাঁর সঙ্গে অলক্ষিতে প্রবেশ করিয়া সেই চোঙ্গার মধ্যে কি কি আছে, তাহা আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী হইয়া তাড়া খাইতাম। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি অবাধে তাঁর সেই চোঙ্গাগুলি দখল করিয়া বসিলাম। আমার মনে আছে, আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের পুকুর পাড়ে বসিয়া আমি সেই চোঙ্গাগুলি খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে লাল, কালো—নানারূপ ঔষধের বটিকা ছুড়িয়া পুকুরে ফেলাইয়াছিলাম। এই ভাবে কত পূর্ণচন্দ্র রস, মহালক্ষ্মী-বিলাস, কস্তূরী-ভৈরব, রামবাণ, মকরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধ আমার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পুকুরে পড়িয়া চরম শান্তিলাভ করিয়াছিল। পিতামহের ঋণ এই ভাবে শোধ করিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ সেই বাঁশের চোঙ্গাগুলি আমি পুকুরঘাটের তক্তার উপর বাড়ি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলাম এবং আমার পিতামহ সম্বন্ধে এই শেষ ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বাটীতে প্রবেশপূর্ব্বক মায়ের আঁচলের নিকট ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

---

(৩)

সুয়াপুর গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস।

সুয়াপুরের কথা ভাবিতে মন করুণ-রসে আর্দ্র হয়। শুনিয়াছি, সুখাবতী বৌদ্ধদিগের স্বর্গ, যেমন বৈকুণ্ঠ ও অমরাবতী হিন্দুদের। সমস্ত প্রাচীন কুলজী গ্রন্থে—সুয়াপুর গ্রামকে 'সুয়াপুরী' বলিয়া উল্লেখ আছে, সুয়াপুরী অর্থ সুখপুরী—ইহা 'সুখাবতীর'ই বোধ হয় নামান্তর। শুধু নামটি দেখিয়াই আমি মনে করিয়াছিলাম, এই গ্রাম অতি প্রাচীন ; কারণ যে কালে 'সুখ' শব্দটির স্থলে 'সুয়া' রূপ প্রাকৃত শব্দ ব্যবহৃত হইত, সে আজ কালকার কথা নহে। এক সময়ে 'সুয়ো রাণী' ও 'দুয়ো রাণী' কথায় প্রচলিত ছিল। তাহার অর্থ—'সুখী রাণী ও দুঃখী রাণী'। এখনও আমরা আমাদের শত্রুদিগকে 'দুয়ো' দিয়া থাকি। যে সময়ে গ্রাম পত্তন করিয়া তাহার নাম 'সুয়াপুরী' রাখা হইয়াছিল, তখন 'সুখ' শব্দ সাধারণ্যে 'সুয়া' রূপেই প্রচলিত ছিল। সেটি সংস্কৃত ভাষার পুনরুত্থানের পূর্ব্বে—প্রাকৃত ভাষার যুগে। অন্ততঃ ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে শব্দটির এইরূপ প্রাকৃতিক ব্যবহার থাকার কথা।

তার পর এই গ্রামের পুরাতত্ত্ব সন্ধান করিয়া আমি যাহা আবিষ্কার করিয়াছিবাম, তৎসম্বন্ধে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ গ্রাম বেষ্টন করিয়া যে একটা বৃহৎ পরিখা ছিল, তাহার নিদর্শন এখনও আছে। বেনে পাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া দাসপাড়া ও ব্রাহ্মণপাড়া বেষ্টনপূর্ব্বক বিশ্বম্ভর সাহাদের বাড়ী অবধি এই পরিখা বিস্তৃত ছিল। বিশ্বম্ভর সাহাদের বাড়ীর পর সেই পরিখা শেষ হইয়া গিয়াছে।

বর্ষাকালে এই সীমা-চিহ্নিত স্থানটি এখনও একটি সুদীর্ঘ খালে পরিণত হইয়া যায়। বিশ্বম্ভর সাহার বাড়ীর পর হইতে গুপ্তপাড়া আরম্ভ, তাহা এখন খুব সমৃদ্ধ হইলেও উহা অপেক্ষাকৃত নূতন পত্তন। গুপ্ত-পাড়ার পশ্চিম প্রান্তে একটি দীঘি ছিল—তাহার নাম 'দিবাকর'। এই দীঘির পাড়ে শ্মশান ছিল। এখনও গ্রামের কোন কোন নিম্নশ্রেণীর বৃদ্ধা রাগিয়া গেলে "তোকে দিবাকরে দেব" এইরূপ অভিশাপ দিয়া থাকে। দিবাকর দাস ঐ দীঘি কাটাইয়া তার পাড়ে কালী স্থাপন করিয়াছিলেন। সে ৫।৬ শত বৎসরের কথা।

পূর্ব্বোক্ত পরিথার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে একটা জায়গা আছে, তাহা এখনও 'রাজার বাড়ী' নামে বৃদ্ধদিগের নিকট পরিচিত, এবং তাহার অনতিদূরে রেবতী চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থানটির নাম ছিল 'হাতীর পিলখানা'। রাজবাড়ীর পূর্ব্ব দিকে একটা উঁচু জায়গা এখনও আছে, তাহার নাম 'কোটবাড়ী'। প্রাচীনকালে পূর্ব্ববঙ্গে 'কোটবাড়ী' বলিতে দুর্গ বুঝাইত *। দাসদের পাড়ায় রাধাকান্তের মন্দির হইতে সুরু করিয়া অভয় সেন মহাশয়ের বাড়ী ছাড়িয়া আরও খানিকটা দূর পর্য্যন্ত ৫।৭ হাত মাটী খুঁড়িলে সর্ব্বত্র একটা সুদীর্ঘ প্রাচীরের শীর্ষ দেশ টের পাওয়া যায়। এই বৃহৎ সীমা জুড়িয়া ছোট ছোট লাল রঙ্গের ইষ্টক পাওয়া যায়। সমস্ত গ্রামটি প্রাকার-বেষ্টিত ছিল কিনা বলা যায় না। রাধা-কান্তের মন্দির এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা প্রায় ১৭৫ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৃদ্ধদিগের মুখে শোনা যায়, ঐ মন্দির নির্ম্মিত

* কোন কোন প্রাচীন তাম্রশাসনে 'কোটপালক' শব্দ পাওয়া যায়। 'কোট-পালক' অর্থ 'দুর্গপালক' এবং এই শব্দ হইতেই বোধ হয় 'কোটাল' শব্দের উৎপত্তি।

হইবার পূর্ব্বে দোচালা ঘরের মত একটা ইষ্টক-মন্দির তথায় ছিল, ফার্গুসন সাহেব এই দোচালা ঘরের অনুকরণে নির্ম্মিত (culviliniar) ছাদযুক্ত ইষ্টকালয় বাঙ্গালাদেশের স্থপতি-শিল্পের বিশেষত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গদেশেই এইরূপ স্থপতির জন্ম এবং ইহা বঙ্গদেশ হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অনুকৃত হইয়াছে। ইহাতে বীম-বড়গা থাকে না, এবং এগুলি সচরাচর খুব টেকসই হয়। এইরূপ মন্দির ৬।৭ শত বৎসর স্থায়ী হইয়া থাকে। সুতরাং সেই পূর্ব্ব-নির্ম্মিত মন্দিরটি অন্তত ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই মন্দিরের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্ব দিকে একটি অতি প্রাচীন পুকুর আছে, তাহার পঙ্ক উদ্ধারের সময় একটা প্রস্তর-স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের সেই অঞ্চল অতি নিম্নভূমি, বর্ষায় ভাসিয়া যায়, প্রস্তরময় পাহাড়—এই স্থান হইতে বহু দূরে;—এত দূরে প্রস্তর আনিয়া যাঁহারা আবাসস্থান বা মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহারা অবশ্যই সমৃদ্ধ ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ঐ পুকুর হইতে করুণার পূজিত ভগ্ন বাসুদেব বিগ্রহ উঠিয়াছিল। দাসপাড়ার দাসগুপ্তেরাই গ্রামের প্রাচীনতম অধিবাসী। তাঁহাদের মধ্যে চিরন্তন প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে যে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে বৈশ্বানর-গোত্রীয় কোন রাজা আনিয়াছিলেন। এদেশে কিম্বদন্তী এবং সর্ব্বত্র প্রচলিত ধারণা এই যে সেন রাজারা বৈশ্বানর গোত্রীয় ছিলেন।

দাসগুপ্তেরা পন্থ হইতে উদ্ভূত। পন্থ বল্লালসেনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পন্থ বালিনছী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং বল্লালসেন তাঁহাকে মহাকুল দান করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার-প্রভু এই পন্থদাস বংশসংভূত।

ইহা সকলেই অবগত আছেন যে বল্লালীকুল প্রথম প্রথম সর্ব্বত্র

স্বীকৃত হয় নাই ; কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এই কৌলিন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কুলজী গ্রন্থে পাওয়া যায়, পদ্ম-দাস হইতে নবম স্থানীয় চণ্ডীবরের পুত্র বিষ্ণুদাস ফৌজদার প্রমুখ তিন ভ্রাতা সুয়াপুর গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। বৈদ্যকুলের শ্রেষ্ঠ—মহাকুলীন এই তিন ভ্রাতা গঙ্গাতীরবর্ত্তী পশ্চিমবঙ্গের স্বীয় আবাসভূমি ত্যাগ করিয়া—কি জন্য এই অবজ্ঞাত পূর্ব্ববঙ্গের এক নিভৃত পল্লীতে আসিয়াছিলেন? স্বদেশে যাঁহাদের গৌরব, মান ও প্রতিষ্ঠার অভাব ছিল না, যাঁহাদের একজন উচ্চ সরকারী খেতাবে ভূষিত ছিলেন—এহেন ব্যক্তিরা কেন এই সুয়াপুরে আসিয়াছিলেন? সম্ভবতঃ সেন রাজাদের এক শাখা এই সুয়াপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহাদেরই আহ্বানে ইঁহারা আসিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে যে যে স্থানে ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বে বৈশ্বানর গোত্রীয় ব্যক্তিরা ছিলেন, সেইখানেই তাঁরা অতি প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। বল্লভদি নামক গ্রামে (ফরিদপুর জেলায়) বৈশ্বানরদের বাড়ীর নিম্নে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের কৃত প্রকাণ্ড তোরণের ভগ্নাবশেষ খুঁড়িলেই পাওয়া যায়, সেই তোরণের ইটগুলিতে নানারূপ দেবমূর্ত্তি ও ফুল ক্ষোদিত দেখা যায়। রাজতুল্য বৈভবশালী ব্যক্তি ভিন্ন এরূপ হর্ম্ম্য কেহ প্রস্তুত করিতে পারিতেন না।

সুয়াপুর রায়দের পাড়ায় শতদল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিত্যক্ত একটা বাড়ীতে মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটা বড় ছাদ ভূনিম্ন হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার মাতা সংস্কারবশতঃ ভয় পাইয়া সে জায়গা আর খুঁড়িতে দেন নাই। অনেকে বলেন, ঐ ছাদই সেই প্রাচীন রাজবাড়ীর একাংশ। উহার নিকটবর্ত্তী পুকুর হইতে বাসুদেব মূর্ত্তি ও প্রস্তর স্তম্ভ উত্তোলিত হইয়াছিল।

সুয়াপুরের কোন কোন স্থান হইতে অতি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে আমি শুনিয়াছি, কিন্তু আমি নিজে দেখি নাই। পদ্মদাসের বংশধরেরা যে এককালে খুব বিক্রমশালী ভূম্যাধিকারী ছিলেন, তাহার বহু প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত রাধাকান্ত মন্দিরে স্থাপিত বিগ্রহের যে কাষ্ঠসিংহাসন ছিল, তাহাতে বিচিত্র দৃশ্য এ পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত ছিল, তাহা প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছিল। সেই সিংহাসন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। সেই সুদর্শন খোদাই চিত্রসমন্বিত কাঠগুলি স্ত্রীলোকেরা উনুনে জ্বালাইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছেন। জলন্ত অগ্নির মুখ হইতে অর্দ্ধ দগ্ধ দুই একখানি এবং নিতান্ত অবহেলায় রক্ষিত জীর্ণ শীর্ণ আর ৩।৪ খানি আমি রক্ষা করিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় শিল্প-সমালোচক এ, কে, কুমারস্বামী ২০০৲ মূল্যে তাহার তিন চারিখানি ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, আমি তাহা দেই নাই। ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্রেঞ্চ সাহেব তাহার একখানি ধার লইয়াছিলেন, তাহা এখনও প্রত্যর্পিত হয় নাই।

সুয়াপুরের নিকটবর্ত্তী 'বাজাসনে' যে একটি বৌদ্ধবিহার ছিল তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে অনেক মৃণ্ময় বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার খনন-কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পরই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই উচ্চ ভূমি খনন করিলে এখনও প্রাচীন ইতিহাসের কতক নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। সুয়াপুরের নিকটবর্ত্তী নান্নাগ্রামে সম্ভবতঃ মুণ্ডিত-শীর্ষ বৌদ্ধভিক্ষুর আবাস ছিল। 'নান্না' শব্দ অর্থ মুণ্ডিত-মস্তক। এখনও সে অঞ্চলে কোন স্ত্রীলোকের চুল না থাকিলে তাহাকে 'নান্নী' বলা হয়। "নাণ্ডামুণ্ডা" "নান্না-মুন্না" প্রভৃতি শব্দ এখনও প্রচলিত আছে, ইহাদের অর্থ 'মুণ্ডিত-শীর্ষ'।

বস্তুতঃ সুয়াপুরও তৎসন্নিহিত বিস্তৃত জনপদ যে বহু প্রাচীন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সুয়াপুর হইতে ৬।৭ মাইল দূরে "ধামরাই" গ্রামে হয় ত অশোকস্তম্ভ বিরাজিত ছিল। সেই গ্রামে অনেক প্রাচীন চিহ্ন এখনও আছে। প্রাচীন দলিল পত্রে এই স্থানটির নাম "ধর্ম্মরাজিকা" রূপে দৃষ্ট হয়। অশোক সমস্ত ভারতবর্ষে ৮৪০০০ গ্রামে বৌদ্ধধর্ম্মের জয়-ধ্বজা উড়াইয়া তাহাতে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন—সেই গ্রামগুলির নাম 'ধর্ম্মরাজিকা।'

এই বাজাসন বিহারে সুপ্রসিদ্ধ দীপঙ্কর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু সুয়াপুরের দাসবংশের আদি উপনিবেশকারী তিন ভ্রাতা যে বিক্রমপুরের দ্বিতীয় বল্লালের আত্মীয় ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। বল্লালসেন-ও শাহ্ খাঁ—সেই ভ্রাতাদের পিসিদ্বয়কে বিবাহ করিয়াছিলেন। কপোতের আকস্মিক আগমনে উদ্ভ্রান্ত হইয়া বিক্রমপুরের রাজ-অন্তঃপুরের যে সমস্ত ললনা জহরব্রত পালন করিয়া অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অগ্রণী রাজমহিষী এই তিন ভ্রাতার পিসী ছিলেন।

সুয়াপুরের অদূরবর্ত্তী সাভারের নাম টলেমির ভৌগলিক বৃত্তান্তে পাওয়া যায়—সে খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীর কথা। তথায় ধীমন্ত, রণধীর হরিশ্চন্দ্র, মহেন্দ্র প্রভৃতি বহু বৌদ্ধ নৃপতিরা রাজত্ব করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র কুবেরের মত ধনশালী হইয়াও বৃদ্ধ বয়সে বৌদ্ধ-মঠ পরিদর্শন পূর্ব্বক ভিক্ষুকের ন্যায় বেড়াইতেন। তাঁহার উপাধি ছিল "রাজর্ষি"। সম্ভবতঃ এই হরিশ্চন্দ্রের দুই কন্যাকে ভারত-প্রসিদ্ধ বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র) বিবাহ করিয়াছিলেন।

সুয়াপুরের নিম্নে যে নদী বহিয়া যাইতেছে, তাহার নাম এখন গাজি-খালি। যে গাজিরা সুয়াপুরের হিন্দু রাজত্ব ধ্বংস করিয়াছিল এবং বাসু-

দেব বিগ্রহের নাক ও পদ্মহস্ত ভগ্ন করিয়া পুকুরে ফেলিয়া দিয়াছিল, সেই গাজিরাই কানাই নদীকে গাজিখালি আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। গাজী আক্রমণের বহুদিন পরেও সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে এই নদীর আদত নাম প্রচলিত ছিল। রেনল্ডসের মান-চিত্রে এই নদীর নাম 'কানাই' দৃষ্ট হয়। কানাই ও বংশাই দুই নদী সাভারের নিকট ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। বংশাই ধামরাই গ্রামের নিকট দিয়া ভাওয়াল ও ময়-মনসিংহ পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছে, কানাই মুসলামান নাম-লাঞ্ছিত হইয়া অর্দ্ধ-পথে শুকাইয়া গিয়াছে।

এই কানাই ও বংশাই সন্নিহিত বিশাল কায়া ধলেশ্বরী—অদূরবর্ত্তী জনপদ, সাভার, ধামরাই, সুয়াপুর, নান্না ও বাজাসন প্রভৃতি গ্রামসমূহকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া—এক সময়ে বৌদ্ধ কীর্ত্তিময় মন্দির ও স্তূপ বিভূষিত হইয়া শোভা পাইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে তান্ত্রিকতা ও বামাচারে এই জনপদ ডুবিয়া গিয়াছিল। বাজাসন-বিহার তখন জ্ঞান-গরিমা হারাইয়া পঞ্চ মকারের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। এজন্য এখন ও বাজাসনের সংশ্রব সুয়াপুরবাসীদের জুজুর ভয় উৎপাদন করে। 'বাজাসনে'র দাস বলিলে পন্থ-দাসেরা ক্ষুব্ধ হইয়া এই প্রবাদ অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান এবং দুই এক ঘর ব্রাহ্মণ 'বাজাসনের ঠাকুর'—এই প্রাচীন প্রবাদের আরোপে উত্তেজনায় অসহিষ্ণু হইয়া গাল মন্দ দিতে থাকেন। অথচ বাজাসন যে কি বস্তু, এই নামের আড়ালে কি কলঙ্ক নিহিত আছে তাহার বিন্দু মাত্র ও তাঁহারা জানেন না। কিন্তু বাজাসনের প্রবাদ সেই অঞ্চল-ময় পরিজ্ঞাত। এখনও যদি আমি বলি আমার বাড়ী সুয়াপুর, তাহা হইলে সে অঞ্চলের লোক বলিবে "কোন সুয়াপুর? 'সুয়াপুর নান্না, মদে ভাতে পান্না' সেই সুয়াপুর নাকি?" বস্তুত—আমাদের গ্রাম যে একশত বৎসরপূর্ব্বে ভৈরবী, চক্রের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহা ভালরূপ জানা আছে। ভদ্র

ঘরের যে সকল মহিলা এই ভৈরবী চক্রে বসিতেন, তাঁহাদের দুই এক জনকে অতিবৃদ্ধাবস্থায় আমি আমার শৈশবে দেখিয়াছি। আমার পিতা-মহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ যে শবারূঢ় হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, সেই ঘটনাও এই গ্রামের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের প্রাচুর্য্য প্রমানিত করিতেছে। *

* বাঙ্গাল পল্লী গুলির অনেক গুলি অতি প্রাচীন। বহু প্রাচীন পল্লীর মন্দিরাদির নিদর্শন মাটীর উপর না থাকিবারই কথা। প্রাচীনত্ব নিরূপন করিতে হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। (১) গ্রামের লুপ্ত ও চলিত পাড়াগুলির নামের লিষ্টকরা—'কোট', 'সদর খণ্ড', 'বাহির খণ্ড', 'পাট গাঁ', 'পাইকপাড়া' প্রভৃতি নাম পাইলে বুঝা যাইবে, সেখানে হয়ত পুরাকালে কোন রাজা ছিলেন। কোট বাড়ী = দুর্গ, পাট (পত্তন হইতে উদ্ভূত) = রাজ-সিংহাসন, পাইক পাড়া = সৈন্য—নিবাস, ইত্যাদি। (২) গ্রামে কোন পরিখার চিহ্ন আছে কিনা? (৩) বড় দীঘি ছিল কিনা, দীঘির কোনো পাড়ে মাটী খুঁড়িলে প্রাচীন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায় কিনা? বাঙ্গালার পল্লীগুলির দীঘি সমূহে এখনও বঙ্গের অৰ্দ্ধেক পুরাতত্ত্ব লুকায়িত রাখিয়াছে, যে হেতু, মুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অনেক সময় হিন্দু রাজগন দীঘির মধ্যে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ফেলিয়া দিয়াছেন। (৪) মন্দির কোন্ দুয়ারি, দীঘি কোন্ দিক্ হইতে কোন্ দিকে খনিত। ইহাদ্বারা হিন্দু, জৈন বৌদ্ধ মুসলমান ইহাঁদের মধ্যে কাহারা সেই কীর্ত্তি নির্ম্মান করিয়াছিলেন, তাহা টের পাওয়া যাইবে। (৫) গ্রামে কোন জায়গা খুঁড়িলে প্রচুর খোলা পাওয়া যায় কিনা? ইতিহাস-পূর্ব্ব, বহু প্রাচীন গ্রাম ও নগর গুলিতে সেইরূপ প্রাচীন খোলা পাওয়া গিয়া থাকে। (৬) গ্রামের প্রাচীন কুলজি-পুস্তক ও অপরাপর হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথির ভালরূপ অনুসন্ধান করা। (৭) বিগ্রহের নীচে, প্রস্তরে বা ইষ্টকে অনেক সময় এইরূপ ভাবের লেখা থাকে যে তাহা লেখা বলিয়াই মনে হয় না। সেই সকল লেখা বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অপর কেহ সচরাচর পড়িতে পারেন না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ভাবের কোন নিদ-র্শন পাইলে তাহা ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া দেখা উচিত। (৮) তাম্র শাসন বা প্রাচীন দলিলাদি কিছু আছে কিনা অনুসন্ধান করা। (৯) গ্রাম্য ছড়া ও প্রবাদ

সংগ্রহ করা—তাহা যতই কেন অমার্জ্জিত ভাষায় থাকুকনা কেন—সেগুলি অগ্রাহ্য না করা। (১০) মুসলমান পাড়াতে যে সকল প্রবাদ পাওয়া যাইবে, অনেক সময় তাহাই সত্যের অধিক সন্নিহিত। কারণ হিন্দুরা সমস্ত প্রাচীন তত্ত্ব পৌরাণিক গল্পের আড়ালে ফেলিয়া দেন ; তাঁহারা রামায়ণ-মহাভারত বর্ণিত কথা দ্বারা সমস্ত ইতিহাস আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। (১১) মুসলমান পাড়া যেদিকে সেই দিকেই সম্ভবত হিন্দুর প্রাচীন রাজধানী ছিল,কারণ বিজয়ীরা হিন্দুর উৎকৃষ্ট স্থানগুলিই প্রথম দখল করিয়া লইয়া তথায় বস-বাস স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। পুরাতত্ত্বের খোঁজ করিতে হইলে প্রথম মুসলমান-পাড়ার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। অনেক সময় হিন্দু মন্দিরের ইট পাথর দিয়া মস্‌জিদ তৈরী হইয়াছিল। সেই সকল ইট পাথরের উল্টা দিক খুঁজিলে দেবদেবীর মূর্ত্তি কখন কখনও দেখা যায়। (১২) সমৃদ্ধ গ্রাম গুলির সকলটিই কোনো না কোনো নদীর পাড়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নদী শুকাইয়া গেলেও নদীর গতি কোন্ দিকে ছিল তাহা খুঁজিয়া বা হির করা (১৩) অনেক বৌদ্ধ দেবদেবী মূর্ত্তি হিন্দু দেবদবী বলিয়া পূজা পাইতেছেন। 'প্রজ্ঞা-পারমিতা, তারারূপে গৃহীত হইয়াছেন। স্বয়ং বুদ্ধ দেব কখনও কখনও শিব এমন কি কালী বলিয়া পূজা পাইতেছেন। পাণ্ডা বা পুরোহিতের কথা এবিষয় একবারেই বিশ্বসনীয় নহে! বাসুদেব মূর্ত্তি আর সূর্য্য মূর্ত্তিতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই, কেবল বাসুদেবের নিম্নে গরুড় ও সূর্য্যের নীচে সাতটি ঘোড়া এবং সূর্য্য মূর্ত্তির পায়ে বুটজুতা পরানো।

—

(৪)

পিতৃদেবের আত্মীয়গণ।

আমার পিতার শৈশব কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা জানিনা, কিন্তু মাতৃহারা বালকের শৈশব যে খুব সুখকর ছিল না, তাহার কোন কোন কথা আমি শুনিয়াছি। পিতৃদেবের মাতামহেরা বাসণ্ডা গ্রাম-নিবাসী ছিলেন, তাঁহাদের বিস্তৃত কারবার ছিল। কিন্তু সেই গ্রামে হটাৎ মড়ক লাগিয়া এই বৃহৎ পরিবার নষ্ট হইয়া যায়, এবং তাঁহাদের সম্পদ, গৃহ এবং বহু আস্‌বাব পত্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ভগবান দাসগুপ্ত ও চন্দ্র মোহন দাসগুপ্ত—আমার পিতামহের শ্যালকদ্বয়—আশ্রয়-শূন্য হইয়া আমাদের বাড়ীতে প্রতিপালিত হন। তাঁহাদের ভগিনী অর্থাৎ আমার পিতামহী-ঠাকুরাণী তখন স্বর্গ-গতা। তাঁহাদের যত্ন নেওয়ার লোক বাড়ীতে বড় কেউ ছিলনা। ভগবান দাস মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন,—"আমরা জীবনে অনেক কষ্ট সহিয়াছি! তোমার বাবার ও যে কষ্ট কম ছিল তাহা নহে, আমাদের মামা ভাগিনেয় তিন জনকে দেখিবার লোক বাড়ীতে কেউ বড় ছিল না। করুণার উনুনের জন্য আমাদের জঙ্গলে কাঠ কাটিতে হইত। করুণা তোমার বাবাকে এ সকল কাজে লাগাইতে দিত না, কিন্তু আমাদের দুই ভাইকে এই মজুরী করিতে হইত।"

কিন্তু এই দুই ভ্রাতার দুঃখ-নিবারণের ব্যবস্থা বিধাতা করিয়া দিলেন। আমার পিতামহের বিধবা ভগিনী লক্ষ্মীদেবী ক্রমশঃ এই দুই বালকের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন—ইহারা উত্তরকালে তাঁহার এতটা স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন—যে তিনিই শেষে ইহাদের মাতৃস্থানীয়া হইয়া-

ছিলেন। বিধবার "নন্দগুলালেরা" এই ভাবে সুয়াপুর গ্রামে বর্দ্ধিত হইলেন। ঐ গ্রামবাসী রামকমল দাস মহাশয়ের চেষ্টায় দুই ভ্রাতা বাঙ্গালা ও পার্শী শিখিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে চলিয়া গেলেন। ভগবান দাস নোয়াখালী জেলায় এক জমিদারের নায়েব হইয়া বেশ দুই পয়সা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমোহন দাস কুমিল্লা মুন্সেফী কোর্টের সর্ব্ব-প্রধান উকীল হইয়া সেই সময়ে মাসে ৪।৫ শত টাকা রোজগার দ্বারা সম্পন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। এই দুই ভাইএর চেহারা বেশ একটা দর্শনীয় জিনিষ ছিল। ভগবানদাস ছিলেন লম্বা, দোহারা,—রাস্তায় যাইতে অন্য সকলের হইতে তাঁহার মাথা এক ফুট উঁচু দেখাইত। তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গী ছিল সরল—উদ্দীপনাময়। চন্দ্রমোহন দাস যেমন যেমন দীর্ঘ, তেমনিই স্থূলাকৃতি ছিলেন। বিশাল গোঁপ-জোড়া ক্ষুদ্র একটা পাখীর পক্ষপুটের ন্যায় কোঁকড়াইয়া বাঁকিয়া তাহার মুখশ্রীর শোভা বর্দ্ধন করিত; তাঁহার হাসি সেই গোঁপজোড়ার মধ্যে মেঘের ভিতর হইতে সূর্য্যাস্তের আলো যেরূপ ফোটে তেমনই ভাবে দেখা দিত। তিনি যখন চলিতেন, তখন তাঁহাকে সুমেরু-মন্দরের মত দেখাইত, দেখা মাত্র তিনি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতেন। তাঁহার স্বভাব ছিল চাপা, কিন্তু কথাবার্ত্তায় বেশ প্রসন্ন ভাব ও উদারতা দেখাইতেন। তিনি কুমিল্লায় ব্যয়কুণ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তিনি সারা বৎসরের পর পূজায় যখন বাড়ীতে আসিতেন—সে একটা মাস বাড়ীতে খুব ধুমধাম করিয়া ব্যয় করিয়া নাম কিনিতেন, গ্রামের সব লোকজন নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। আমার মনে আছে, বন্যা-প্লাবিত গ্রামের কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়াইয়া আমরা শৈশবকালে পুজো-পলক্ষে আগুন্তক প্রবাসী গ্রামবাসীদিগের পা'ল-সমন্বিত নৌকা আসিতে দেখিতাম। এক এক সম্পন্ন ব্যক্তির প্রকাণ্ড নৌকা দৃষ্টিপথে পড়িবার

পূর্ব্বেই আমরা বহু দূরাগত 'ভ্যা' 'ভ্যা' শব্দের ভেরিনিনাদ শুনিতে পাইতাম। বুঝিতাম, শারদীয় উৎসবের মহা উপাচারস্বরূপ বহু ছাগল লইয়া গ্রামবাসী কেউ আসিতেছেন।

চন্দ্রমোহন দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র অবনীমোহন এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া পাগল হন। তাঁহার উন্মত্ততার—কারণ প্রেমব্যাধি। তিনি একটি কন্যাকে পড়াইতেন। সেই কন্যাও কুমিল্লায় ছিলেন। তাঁহাকে বিবাহ করিতে ক্ষেপিয়া গিয়া তিনি যে সকল কাণ্ড করেন, তাহা এখন বলা সম্ভবপর নহে, কারণ কন্যাটী এখন একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহলক্ষ্মী। ঐ কন্যা অবনীবাবুর উন্মত্ত প্রেমোচ্ছ্বাসের কোন সাড়া দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অবনী বাবু সমুদ্রে পড়িলে যেরূপ তৃণ আশ্রয় করিয়া লোক বাঁচিতে চায়, তেমনই সেই কন্যার অন্যত্র বিবাহ ঠিক হইয়া গেলে—তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য একটা প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিধিলিপি! কিছুতেই কিছু হইল না। তার বিবাহ অন্যত্র হইয়া গেল, এবং ধরিয়া বাঁধিয়া যেরূপ লোককে বিষ খাওয়ায়, তেমনই অপর একস্থানে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভগবানদাস তাহার বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিলেন। দুই বিবাহই যথারীতি হইয়া গেল। কিন্তু প্রণয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বোধ হয় একটু হাসিলেন। এই প্রেমভঙ্গে অবনীবাবু এত দূর ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, যে তাঁর স্বাভাবিক প্রফুল্লতা আর ছিল না।

বিবাহ হওয়ার চার পাঁচ মাস পরে সেই কন্যাটির এক ভ্রাতা আমাদের গ্রামে আসিয়াছিলেন। সেই ছেলেটি সেবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ হইয়া সরকারী বৃত্তি পাইয়াছিল, তাহার নাম ছিল "ন"—। অবনীবাবু সেই বার তৃতীয় শ্রেণীতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছিলেন, এবং "ন"—এর সঙ্গে একত্র পড়িয়াছিলেন। "ন"—আমাদের গ্রামে আসিয়া আমাকে বলিল, "চল্,—অবনীর সঙ্গে দেখা করিয়া

আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া অবনীবাবুদের বাড়ীতে গেলাম। দেখিলাম অন্দরের এক ঘরে অবনীবাবু একখানি খট্টায় শুইয়া বই পড়িতেছেন, খট্টাটার চারদিকে কাষ্ঠের কারুকার্য্যময় একটা বেড়া। "ন"—এবং আমি যাইয়া সেই বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইলাম। "ন"—জিজ্ঞাসা করিল—"অবনী, কেমন আছ?" অবনীবাবু মাথা গুজিয়া বই দেখিতে লাগিলেন, একটিবার মাথা উচুঁ করিলেন না, একটি কথা বলিলেন না,—কিন্তু দেখিলাম তাঁহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

এই ঘটনার অল্পকাল পরেই অবনীবাবু পাগল হইয়া গেলেন। কিন্তু পাগল মানে হাত-পা ছোড়া দৌড়-ধাপ, মার-ধর করা গোছের নহে; যেন বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া সমাধিতে বজ্রাসনে বসিয়া আছেন—একবারে তুষ্ণীম্ভাব। কিন্তু তাঁহাদের বাড়ীর পার্শ্বের পুকুর পাড়ে যখন সদ্য বয়ঃ প্রাপ্তা মেয়েরা বাসন মাজিতে আসিত, তাহাদের হাতের চুড়ী ঠুন ঠুন করিয়া কাঁসার থালায় লাগিয়া বাজিয়া উঠিত, তখন যেন বুদ্ধদেবের হঠাৎ ধ্যান ভঙ্গ হইয়া যাইত, তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিয়া পুকুরপাড়ে দাঁড়াইয়া নিশ্চল চক্ষে মেয়েদিগকে দেখিতেন, কিন্তু কোন উৎপাৎ করিতেন না। বলিতে ভুলিয়াছি—তাঁহার উন্মত্ত হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার দুর্ভাগ্য পত্নী ইহধাম ছাড়িয়া গিয়াছিলেন।

চন্দ্রমোহন দাসের দ্বিতীয় পুত্র, যামিনীমোহন দাস প্রত্যেক পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া এম, এ. তে গণিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। তিনি "ল" পাশ করিয়া কিয়ৎকাল কুমিল্লায় ওকালতি করিয়া ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন।

চন্দ্রমোহন দাসের মনের ভাব ছিল, ডিপুটি হইয়া যামিনীবাবু তাঁহার বেতনের টাকা সমস্তই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়া নিজের খরচ বাবদ টাকা

চাহিয়া লইবেন। এই ছিল সেকালের দস্তুর। কিন্তু যামিনীবাবু আধুনিক ধরণের ছেলে, তিনি পিতাকে একটি কড়াও দিতেন না। ইহাতে চন্দ্রমোহন দাস বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ থাকিতেন। কারণ বহুদিবস পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল, তিনি অনেক যত্নে অনেক কষ্টে মাতৃহীন শিশুদিগকে লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি মিতব্যয়ী এবং বৈষয়িক ছিলেন, তিনি স্নেহে প্রতিদান প্রত্যাশা করিতেন। আমি একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ঠাকুরদাদা, ছোট খুড়া (যামিনীবাবু) কি আপনাকে কিছু দেন না ?" সেই বিরাট গোঁপের ব্যূহ ভেদ করিয়া একটা অতি দুঃখের, অতি ক্ষুদ্র চাপা "না" শব্দ বাহির হইল। আমি বলিলাম "ধরুন, এই জ্যৈষ্ঠমাস, তিনি কি দু'এক ঝুড়ি আম কিনিয়া ও আপনাকে খাইতে পাঠান না ?" দেখিলাম তাঁহার দুটি চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। তিনি আর কিছু না বলিয়া সুমেরু-কল্প বৃহৎ দেহখানি উঠাইয়া ডান হাতে পাখা খানি সঞ্চালন করিতে করিতে অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। এর পরে তাঁকে আর অনুসরণ করিয়া প্রশ্ন-বাণ-বিদ্ধ করা নিষ্ঠুরতা মনে করিলাম।

এর পরে যামিনীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—"ঠাকুরদাদাকে আপনি একটি পয়সাও দেন না—এ ব্যবহার কি ভাল করেন ?" তিনি বলিলেন "আমার পিতা আমার মত চারটা ডিপুটি কিনিতে পারেন—তাঁহার এত টাকা আছে। ও সকল বৃথা ও অনাবশ্যক ভাল-মানুষী আমি করতে জানি না।"

উভয় পক্ষেরই ভাব দেখিলাম, কিন্তু যামিনীবাবুর কথায় মনে সায় দিল না।

যামিনীবাবু বহুদিন তাঁহার স্ত্রী ও কয়েকটি সন্তান তাঁহার বাপের নিকট ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। ৪।৫ বছর এই ভাবে চলিয়াছিল।

এমন কি যামিনীবাবুর প্রথমা কন্যার বিবাহের ও সমস্ত খরচ চন্দ্রমোহন বাবুকে দিতে হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে যামিনীবাবু ইত্যবসরে কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়া লইবেন, এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম সময়ে নোয়াখালীর সেটেল্‌মেণ্ট আফিসরের কাজ করিয়াছিলেন। তখন আমাকে বলিয়াছিলেন "পাথেয় (travelling allowance) সমেত হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, আমি ৫৩৩ টাকা মাসিক পাইব। সেখানে আমি একা প্রাণী। ৩৩ টাকায় রান্তার খরচ শুদ্ধ আমার একার খরচ চলিয়া যাইবে ; আর ৫০০ টাকা প্রতিমাসে সঞ্চয় করিব।" এই শেষ কথা বলার সময় তাহার চক্ষে একটা অপূর্ব্ব উদ্দীপনার ভাব দেখিয়াছিলাম।

আপনারা যামিনীবাবুকে চিনিবেন। ইনি হচ্ছেন সেই ডিপুটি, যিনি নিজ পুত্রের ডাকাতি ধরাইয়া তাহাকে জেলে পাঠাইয়াছিলেন। সেই ছেলেটিকে আমি জীবনে দেখি নাই। শুনিয়াছি যে 'এপ্রুভার' হইয়া অব্যাহতি পাইয়াছিল এবং বিলাতে বহু বৎসর কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাকে ধরাইয়া দিয়া যামিনীবাবু অতি উৎকৃষ্ট কাজ করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে সমস্ত পরিবারকে জেলে যাইতে হইত। কিন্তু এই ঘটনায় পিতামাতা যে কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। যেমন বিশাল শাল্মলী তরুবরের ডাল ঝঞ্ঝায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেইরূপ চোখের সাম্‌নে দেখিলাম,—সৌম্য-দর্শন, অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতার মূর্ত্তি যামিনীবাবু এই ঘটনায় নীরবে শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। আমার খুড়িমাকে আদালতে পুনঃ পুনঃ যাইয়া সাক্ষ্য দিতে হইয়াছে, এই অপমান যামিনীবাবু সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি আলিপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্টেট হইয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল পদ-গৌরব তাঁহাকে শান্তি বা স্ফূর্ত্তি দিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম গভর্ণ-

মেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাঁকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, এই অপমান তাঁহার প্রাণে শেলের মত বিঁধিঁয়াছিল। তারপর নিজের প্রিয় পুত্রের বিরুদ্ধে সস্ত্রীক আদালতের সমক্ষে পুনঃ পুনঃ সাক্ষ্য দেওয়া যে কিরূপ মর্ম্মবিদারক কার্য্য তাহাও সহজে অনুমেয়। তাঁহার শরীর বেশ ভাল ছিল, তিনি কখনও স্বাস্থ্য-নীতি লঙ্ঘন করেন নাই। অথচ যে নিদারুণ কষ্টে তিনি ক্রমে হীনবল হইয়া মৃত্যুর কোঠায় পা দিয়ে চলিলেন, তাহা আর কি বলিব? আমি একদিন দেখিলাম, তিনি জ্বর গায়ে আলি-পুর কোর্টে যাইতেছেন—আমি বলিলাম, "ছোট খুড়া, আজ না হয় নাই গেলেন।" কিন্তু তিনি কুইনাইনের কৌটা দেখিয়া বলিলেন, "ঢাখ্, রোজ ২৫।৩০ গ্রেণ কুইনাইন খাই, এই ভাবে কাজ করি।" তিন মাস তিনি ঘুসঘুসে জ্বর লইয়া কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন বিছানা হইতে উঠিতে পারিলেন না, তখন আর কি করিয়া যাইবেন? মৃত্যু সজোরে আসিয়া তাহার কর্ম্মোৎসুক দেহকে নিরস্ত করিয়া রোগশয্যায় কয়েকদিন আট্‌কাইয়া রাখিয়া শেষে শেষ-মুক্তি দিয়াছিল।

ইতিমধ্যে কতদিন আমি তাঁহাকে বলিয়াছি, "ছোট খুড়া, আপনি আমার বেহালার বাড়ী দেখিলেন না, আলিপুরের এত কাছে!" কয়েক বার তিনি আমার এই সনির্ব্বন্ধ আমন্ত্রণের পাশ কাটিয়া অন্য কথা পাড়িতেন। শেষে আমি নাছোড়বন্দা হওয়াতে একবার বলিলেন, "আমার যাইতে ভয় হয়।" তখন বুঝিলাম, ডাকাতেরা অনেক ভয়ের চিঠি পাঠাইয়াছে; পাছে পথে হত্যা করে, এই ভয়ে তিনি কোথায়ও যাইতেন না। কিন্তু তিনি খুড়ীমাতাকে বেহালায় দু'তিনবার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে তিনি আমাকে তাঁহার পুত্রকে পাঠাইয়া দুতিন বার ডাকিয়া পাঠাইয়া ছিলেন,—কিন্তু তখন তিনি বাসা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সে বাসা আমি চিনিতাম না, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম, এ, আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া যাইবেন—এই ভরসা দেওয়ায় ও তাঁহার মৃত্যু যে এত সন্নিহিত তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি যথাসময়ে যাইতে পারি নাই, তজ্জন্য চিরসন্তপ্ত রহিয়াছি। শেষের দিন গিয়াছিলাম, তখন তাঁহার বিকার, আমি যাইয়া তাঁহার হাতখানি আমার হাতের মধ্যে রাখিলাম, তিনি "কেও?" বলিয়া একবার চাহিলেন, এবং "দীনেশ" এই বলিয়া চক্ষু বুজিলেন। তার পর ভয়ঙ্কর কষ্টসূচক কয়েকটি অসংলগ্ন কথা বলিয়া ১০ মিনিট পরে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার জীবনে পিতৃ অভিশাপের ফল যেন আমি স্পষ্টভাবে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি বা তাঁহার পত্নী তাঁহাদের কষ্টের সঙ্গে যে পিতার মনে দুঃখ দেওয়ার কোন সংশ্রব ছিল, তা একবারেই মানিতেন না, বরং সুয়াপুরের পাকা বাড়ীঘর এবং সঞ্চিত টাকার অংশ তাঁহাকে না দিয়া যাওয়ার দরুণ তাঁহাদের উভয়েই চিরদিন ক্রুদ্ধ ছিলেন।

চন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের চতুর্থপুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এখন সব্‌জজিয়তী করিতেছেন।

কিন্তু তৃতীয় পুত্র কালীমোহন দাসের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইহাকে আমি "কাকা" বলিয়া ডাকিয়া থাকি। এবং কথাবার্ত্তায় খুল্লতাত যোগ্য কোন মর্য্যাদা স্বীকার না করিয়া "তুই" শব্দে ব্যবহার করি। কাকার মত কালো নিগ্রো-রাজ্যে পাওয়া গেলেও বঙ্গদেশে সুলভ নহে; চেহারা লম্বা, সর্ব্বদাই মুখে হাসিটুকু লাগিয়া আছে। লেখাপড়া চর্চ্চাটা বেশী হয় নাই—এণ্ট্রান্স-ক্লাশে যাইয়াই

উপরে উঠিবার পথঘাট না পাইয়া বাড়ীতেই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ইনি চন্দ্রমোহন দাসের প্রিয়পুত্র ছিলেন, যেহেতু লেখা পড়া ভাল না শিখায় ইহার ভবিষ্যৎসম্বন্ধে পিতা নিরতিশয় দুর্ভাবনা ভাবিতেন। সুয়াপুর গ্রামে যখন চন্দ্রমোহন দাস পাকা বাড়ী তৈরী করিতে ছিলেন, তখন সেই এমারত নির্ম্মানের ভার দিয়াছিলেন, কালী মোহনের উপর। সে টাকা ভাঙ্গিয়া গ্রামবাসীদিগকে পোলাও কোরমা খাওয়াইয়া বেশ যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছিল। এই সংবাদ পাইয়া চন্দ্রমোহন বাবুর যে কষ্ট হইয়াছিল, বোধ হয় কালীমোহনের মৃত্যু সংবাদ পাইলে তাহার ততটা হইত কি না সন্দেহ; কারণ তিনি ছেলে মেয়েদেরে ভাল বাসিতেন সত্য, কিন্তু সম্রাটের নামঙ্কিত গোলকের তুলনায় সে ভালবাসা দাঁড়াইতে পারিত না। যতই কেন রাগ না করুন, মরিবার সময় সঞ্চিত টাকার অনেকাংশ তিনি কালীমোহনকেই দিয়া যান, এবং চেষ্টা করিয়া উহাকে ৪০ টাকা মাহিয়ানার একটা কাজ কুমিল্লা কলেক্টরীতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শেষবার চক্ষু মুদিত করিয়া ধরাধাম ত্যাগ করেণ।

মনে হইতেছে যেন কালীমোহন 'দাইল কোম্পানি' কিংবা অন্য কোন কোম্পানির নাম দিয়া একটা ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসে,—সেটা একটা মস্ত বড় আড্ডার স্থান হয়,—বন্ধুরা কৃপা করিয়া সেই দোকানে সন্ধ্যায় পদধূলি দিতেন। কর্ত্তৃপক্ষগণ অভ্যাগতদিগকে অভ্যর্থনা-পূর্ব্বক প্রত্যেককে দোকানের মিশ্রি হইতে এক এক গ্লাস সরবৎ খাওয়াইতেন, শেষে এমন দাঁড়াইয়াছিল যে রোজ প্রায় ৬০।৭০ গ্লাস মিশ্রির সরবৎ খরচ হইত। এইভাবে সেই কোম্পানির লীলা অবসান হয়। তখন কি এক অপরাধে তাহার কাজটি যায়, এবং তিনি পিতৃদত্ত ২০০০০৲ টাকা লইয়া বাড়ী আসিয়া সখের নাট্য-

দলের প্রতিষ্ঠা করেন, বোধ হয় তিনি তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণঠাকুর সাজিতেন, কারণ সেই বেশেই তাহাকে ভাল মানাইত। দলের প্রত্যেক লোককে এবং আগুন্তকদিগকে পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যহ ছাগ মারিয়া, পোলাও করিয়া দুই বেলা খাওয়াইতেন। এই অবস্থায় দুচারি বছর, তাহার বাড়ীতে এরূপ ধুমধাম চলিল, যেন জাহাঙ্গীর বাদসার বিবাহ হইতেছে। তারপর রৌপ্য চক্রগুলি ভগবানের সুদর্শন চক্রের ন্যায় আকাশে চলিয়া গেল, এবং এখন কালীমোহন দৈন্যের চরম দশায় পড়িয়া ছোট ভাই জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সবজজের দত্ত মাসিক কয়েকটি টাকার উপর নির্ভর করিয়া কায়ক্লেশে বহু সন্ততিপূর্ণ পরিবার পালন করিতে-ছেন। তাঁহার হস্তের প্রসার এখনও কমে নাই। যে দিন ভাতৃ-দত্ত টাকা কয়েকটা আসে, সেই দিন রুইমৎস্য ও ভাল সন্দেশ খাইয়া বেজায় স্ফূর্ত্তির সঙ্গে বাগানে বেড়াইতে থাকেন, তার পরদিন হইতে ধার করি-বার জন্য এখানে সেখানে ঘোরেন।

কিন্তু ইহার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ। পরকে খাওয়াইয়াই ইহার আনন্দ, এবং তাহা না পারিলে যে ইনি কি কষ্ট বোধ করেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভগবান এই নিরীহ উদার-প্রকৃতি লোকটির উপর নির্ম্মম হইয়া যেন শিক্ষা দিতেছেন কার্পণ্যই প্রশস্ত, মুক্ত-হস্ততা বিধেয় নহে। অবশ্য কাণ্ডাকাণ্ড-বুদ্ধি-রহিত্বতাটা ভগবানের নিকটও অমার্জ্জনীয়।

তিন বৎসর অতীত হইল, আমি সুয়াপুর গিয়াছিলাম। বহু দিন পরে মাতৃভূমি দেখিতে যাওয়া, প্রায় ৩৩ বৎসর পরে। আমার বাড়ীর ভিটার পথেই কালীমোহন দাসের বাড়ী। আমি ঘাটে নৌকা লাগাইয়া তাহাদের বাড়ীতে উঠিয়া ডাকিলাম, "কাকা বাড়ী আছিস্?" উত্তরে

শুনিলাম "বাড়ী নাই"। কিন্তু তথা হইতে ফিরিয়া যাইরা শুনিতে পাইলাম, কাকা বাড়ীতে ছিল, কিন্তু তাহার হাতে একটা পয়সা ছিল না—যে আমাকে জল খাওয়াইয়া আদর করিতে পারে,—আমি এতদিন পরে বাড়ী আসিয়াছি—সেই ক্ষোভে ও শোকে সে আমার গলার আওয়াজ পাইয়া তাহার শয্যাগৃহের খট্টার নীচে লুকাইয়াছিল।

কালীমোহনের বাহিরটা যে পরিমানে কালো, মনটা সেই পরিমানে সাদা। সে যেরূপ অভাবগ্রস্ত, সেই পরিমানে ব্যয়শীল। জীবনের অনেক ভুল ভ্রান্তি সত্বেও এই সচ্চরিত্র অথচ দুঃস্থ ব্যক্তির প্রতি মনটা সহজেই অনুরাগী হয়, এবং ইহার সঙ্গ-সুখের জন্য চিত্ত লালায়িত হইয়া থাকে।

(৫)

পিতৃদেবের কথা।

আমার পিতৃদেব ঈশ্বরচন্দ্র সেন ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সুয়াপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শৈশব জীবনে তাঁহার মাতুলদ্বয় ভগবান দাস ও চন্দ্রমোহন দাসের সঙ্গে গ্রাম্য আমোদ প্রমোদ, যথা নৌকা লইয়া নদীতে "বাছ" দেওয়া, গাছে গাছে উঠিয়া আম পাড়া, প্রভৃতি করিয়া বেড়াইতেন। রঘুনাথ সেন মহাশয় পুত্রটিকে স্বীয় মক্তবে বাঙ্গলা ও ফার্শী পড়াইয়াছিলেন। পিতা ছোটকাল হইতেই শান্ত-শিষ্ট বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মাতৃহীন বালক; পিতা বৃক্ষ-বপন লইয়া ব্যস্ত, জ্যেষ্ঠতাত শব সাধনায় রত, কে তাঁহাকে দেখিবে? রঘুনাথ সেনেরা তখনও মাতুলের সংসারেই ছিলেন। তাঁহার মাতুল ভ্রাতা রামকুমার দাসের তখনও সন্তানাদি হয় নাই। শ্রীযুক্ত দেবীচরণ দাস লিখিয়াছেন, "রামকুমারদাসের পেয়ারের ছিল শিশু-ঈশ্বরচন্দ্র। তিনি তাহাকে জরির জুতা, সাটিনের চাপকান, ইজার ও জরিপাড় চাদর ও নানাপ্রকার মূল্যবান কাপড় পরাইয়া সুখী হইতেন।" বালকের বর্ণ গৌর ছিলনা, কিন্তু শ্যামবর্ণের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া রংটি প্রায় গৌরবর্ণকে ধরিবে ধরিবে করিয়াছিল, ইহার মধ্যেই আদি শিল্পীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া গেল। চুলগুলি কোঁকড়ান ছিল, আর এতবড় ডাগর পদ্মের পাপড়ির মত চোখ দুটি খুব কমই দেখা যাইত। গৌরবর্ণ না হইয়াও ছেলে দেখিতে এত চমৎকার হইতে পারে, লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া বলাবলি করিত। বুদ্ধি ও

কমনীয়তা পূর্ণ চেহারায় মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের তাৎকালিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি —ঢাকা জেলা কোর্টের সরকারী উকীল গোকুলকৃষ্ণ মুন্সী মহাশয় তাঁহার কন্যা রূপলতা দেবীকে ইহাঁর সঙ্গে বিবাহ দেন ; তখন আমার পিতার বয়স ১৫।১৬। মুন্সী মহাশয়ের এই বিবাহে সম্মত হইবার অপর এক-কারণ—আমরা কুলীন ছিলাম।

এই বিবাহের পরে পিতৃদেব ঢাকা জেন্দাবহরের গলিতে তাঁহার শ্বশুরালয়ে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তখন রাজা রামমোহন রায়ের 'পৌত্তলিকতা নিরাসন' 'বেদান্তসূত্র' প্রভৃতি পুস্তক বাহির হইয়াছে। পিতৃদেব ঢাকায় আসিয়া ইংরেজী শিখিবার বিশেষ সুবিধা পান, এবং অল্প সময়ের মধ্যে ঐ ভাষায় পারদর্শী হইয়া উঠেন।

তখন ইংরেজী শিক্ষার ফলে যাহা হইত তাঁহার তাহাই হইল, তিনি নব ব্রাহ্মমতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। এদিকে আমার মাতামহের আবাসে নিত্য কবিগান, যাত্রা, এবং দেবদেবীর উৎসব হইত। কিন্তু আমার পিতা শান্ত ও মৃদুস্বভাব হইয়াও তাঁহার প্রবল প্রতাপান্বিত শ্বশুরের অনুরোধ-উপরোধ এড়াইয়া একটা নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে একাকী বসিয়া পড়াশুনা করিতেন। তিনি কোন ঠাকুর দেবতার নিকট মাথা নোয়াইতেন না, কোন যাত্রা বা কবিগানের আসরে উপস্থিত হইতেন না, কোন পূজা বা উৎসবে যোগ দিতেন না। কবির দলে স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া গাইত। খেমটা নাচ ও বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা তখন আসর মাৎ করিয়া দিত। সেই আসর কখনও ভক্তির বন্যায় ভাসিয়া যাইত, কথকতা ও কীর্ত্তন শুনিয়া লোকেরা যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিত ; তখন এমনই প্রাণ ছিল, এমনই দান ছিল ! কিন্তু আবার কখনও অতি কদর্য্য বিকৃত রুচির গান—যাহার নাম ছিল "লাল" তাহা ছেলেতে বুড়োতে একত্র হইয়া

শুনিত। ভোলাময়রা ও গোপাল উড়ের কথা কে না শুনিয়াছে? এইতো যুগ! শিক্ষিত আধুনিক তন্ত্রী যুবকেরা কবি ও যাত্রার প্রতি যেরূপ বিমুখ ছিলেন, কীর্ত্তন ও কথকতার প্রতি ও সেইরূপই বিমুখ ছিলেন। তাঁহারা এ সমাজের ভালমন্দ উভয়ের কিছুই চাহিতেন না; আত্মনিষ্ঠ, স্বীয়শ্রেষ্ঠত্বে নিঃসংশয়,—ভাবের শুষ্ক এক ব্রহ্ম-ডাঙ্গায় বসিয়া—আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেন। আমার মাতুলেরা আমার পিতাকে কিছুতেই আমোদ উৎসবের আসরে টানিয়া আনিতে পারিতেন না, তাঁহাদের চেষ্টার বাড়াবাড়ি হইলে তিনি স্বীয় প্রকোষ্ঠে অর্গল বন্ধ করিয়া ফেলিতেন।

পিতার প্রতিষ্ঠা ঢাকার নব-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজে বাড়িয়া চলিল; আমার মতামহ এরূপ দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন, যে তাঁহার কথার প্রতিবাদ তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। বিশেষ নিজ পরিবারের মধ্যে তাঁহার অখণ্ড প্রতাপের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটিলে তাঁহার ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিত। অথচ মৃদু স্বভাবাপন্ন পিতা তাঁহার বাটীতে থাকিয়া কোন পূজার উৎসবে যোগ দিতেন না, কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা দেব-প্রতিমার নিকট মাথা নোয়াইতেন না। প্রকাশ্যে কোন বক্তৃতা করিয়া প্রতিবাদ তিনি করিতেন না, কিন্তু ঐরূপ কোনবিষয়ে আদিষ্ট হইলে তিনি তাঁহার বড় দুটি শান্ত চোখে আমার মাতামহের দিকে চাহিয়া বিনতি সহকারে বলিতেন "আমি পারিব না", ফুলদলে যেন শাল্মলীতরু কাটা যাইত; মাতামহ ভিতরে যতই কেন বিরক্ত না হউন, তাঁহার শান্তস্বভাব ধীর গম্ভীর জামাতার কাছে যেন নিতান্তই হীনবল হইয়া পড়িতেন, কারণ তিনি জানিতেন আমার পিতা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি মৃদুভাবে বলিলেও সে কথার পশ্চাতে দুর্জ্জয় নৈতিক শক্তি লুক্কায়িত আছে। এ কথার উপর জোর করিলে তিনি জামতাটিকে

চিরদিনের জন্য হারাইবেন; তিনি সে বাড়ীতে আর তিলার্দ্ধকাল থাকিবেন না, এবং আমার মাতামহী তাহা হইলে অন্নজল ত্যাগ করিবেন, এবং মাতামহেরও নিন্দার অবধি থাকিবে না, কারণ পিতৃদেবকে তাঁহার চরিত্রের গুণে চাকর-বাকর হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত।

ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও আমার পিতৃদেবকে মাতামহ অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। কোন সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার কথা শুনিলেই তাহা স্থির বিশ্বাস করিতেন। "ঈশ্বর ইহা বলিয়াছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঘটনা এইরূপ।" সত্যবাদী বলিয়া তিনি পিতাকে জানিতেন এবং সমস্ত বিষয়ে তাঁহার মত লইয়া কার্য্য করিতেন।

আমোদপ্রমোদের বিরুদ্ধে স্বগৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া তিনি কি ভাবে সময় কাটাইতেন, তাহা তাঁহার রচিত "সত্যধর্ম্মোদ্দীপক নাটকে" কবিতার ছন্দে লিখিত আছে।

বাসনা যদ্যপি হয় আলোক দর্শনে।
চল মন হেরি গিয়ে সুদৃশ্য গগনে॥
শুধেন্দু যথায় করে নিত্য বিচরণ।
লইয়া নক্ষত্র সব অনুচরগণ॥
নৃত্য সন্দর্শনে যদি হও আকিঞ্চন।
কেন মন নাহি যাও শিখির ভবন॥
সঙ্গীত শ্রবণে যদি হয় ব্যাকুলিত।
বিহঙ্গম গানে মন হবে প্রফুল্লিত॥
উচ্চাসন সিংহাসন ক্ষেবের কারণ।
নাহি ভেদাভেদ তথা করিতে দর্শন॥
অনায়াসে লভ তারা সবাকার ঠাঁই।
ভূপতি বরিয়ে কিছু বিভিন্নতা নাই॥"

অবশ্য নৃত্য দর্শন করিতে হইলে যে রূপসীকে একবারে বর্জ্জন করিয়া ময়ূরময়ূরীর পেছন পেছন ছুটিতে হইবে এবং চন্দ্র-নক্ষত্র-ভূষিত আকাশ দেখিয়াই যে আমার দীপোজ্জ্বল হর্ম্ম্যরাশির উৎসবের প্রতি বিমুখ হইয়া বসিব—একথা আমি মানিয়া লইতে পারিব না। কিন্তু সেকালে ব্যভিচারের স্রোত এরূপ চলিয়াছিল, যে নৈতিক বলসম্পন্ন দৃঢ়চরিত্র ও পবিত্রচেতা যুবকদিগের এই সকল আমোদপ্রমোদের বিরুদ্ধে একটা প্রবল ভ্রূক্ষেপ-শূন্য প্রতিকূলতা দেখাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। নৈতিক যুদ্ধক্ষেত্রে পিতৃদেব বীরের ন্যায়ই যুঝিয়াছিলেন।*

---

* ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যা লণ্ডনের 'এসিয়াটিক রিভিউ' পত্রিকায় আমার একটি জীবতচরিত প্রকাশিত হয়—তাহাতে পিতৃদেব সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত আছে:—

Mr. Sen's maternal grandfather was a typical Bengali country gentleman, lavish in expenditure on the musical plays called yatras and other such amusements, which being performed before the family temple are held to give pleasure to gods as will as to mortals. All such dissipations were uncongenial to Mr. Sen's father who thought them at once frivolous and irreligious.He was something of an authority on the doctrines of Samaj and wrote books on the subject. He also composed hymns and spiritual songs, one of which is roughly translated, to the following effect, "My soul, if you would enjoy the sight of beautiful dancing, what need is there to frequent gaudily-dressed daneing girls ? what is more entrancing than the dance of the peacock ?What bayde're's dress can compare with his splendid attire ? And if you love the brilliant midnight illumination of royal palaces, what can compare with the glorious firmament where the moon holds court among his minister stars ? In courtly entertainments a petty question of precidence may cause jealosy and heart-burning, but here is an entertainment open to all, king and cowhard alike.

সম্ভবতঃ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক রচিত হইয়াছিল—এই পুস্তকের ভাষা সেই আমলের ভাষার পক্ষে বেশ সরল রচনা, তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাস রচিত হয় নাই, তখনকার কবি ছিলেন রঙ্গলাল এবং দ্বারকা নাথ অধিকারী।

তাঁহার রচনার উৎকৃষ্ট অংশ শেষের দিকে ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, যাহা পাইয়াছি—তাহা হইতেই কিছু নমুনা দিতেছি :—

"দুর্গানন্দ—ভাল, পূর্ব্বে যখন আপনার সহিত রাজা রামমোহন রায়ের সভায় বিচার হইয়াছিল, তখন ত আপনি শাস্ত্র ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এক্ষণে যে তাহা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করিতেছেন, এমন অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন কি প্রকারে হইল?

"ব্রহ্মানন্দ—হাঁ, তখন ব্রাহ্মরা বৈদান্তিক ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু যেমন পৃথিবীর প্রাক্কাল হইতে সমুদয় বিষয়ই উন্নতি লাভ করিতেছে, তেমনই ধর্ম্মমতও এক্ষণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে।

"দুর্গানন্দ—আশ্চর্য্য! আপনি যে সমুদয় বিষয়েই এককালীন বিপর্য্যয় ভাবাবলম্বন করিয়াছেন, কেন না পৃথিবীর কোন বিষয়েই এক্ষণে উন্নতি লাভ হয় নাই, বরং দুষ্কর্ম্মেরই উন্নতি হইয়াছে। সত্য যুগে কিরূপ সমতা ভাব ছিল, ধর্ম্ম যেন তৎকালে পৃথিবীতে মূর্ত্তিমান ছিলেন। বিধা ভাব কাহাকে বলে, তখন তাহা জানিত ছিল না। তবে কি প্রকারে পৃথিবী উন্নতিশালিনী হইল?

"ব্রহ্মানন্দ—পৃথিবীর সকল বিষয়ে কি উন্নতি হয় নাই? দেখুন, পুরাকালে মানুষেরা বৃক্ষকোটরে এবং মৃত্তিকার নীচে গর্ত্ত খনন করিয়া অবস্থান করিত। এক্ষণে সুরম্য মনোহারী হর্ম্ম্যাবলী শিল্প-কার্য্যোন্নতি পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। লৌহের গুণ অপরিচিত থাকায় পূর্ব্বে কেবলমাত্র বাহুযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধই প্রচলিত ছিল, ক্রমে লৌহের গুণ প্রকাশিত হইলে অস্ত্রযুদ্ধ, পরে বাণযুদ্ধ প্রচলিত হয়, তৎপরে চীনদেশে বারুদের গুণ আবিষ্কৃত হওয়া অবধি বন্দুক দ্বারা যুদ্ধের কি অপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে! ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ, রেলরোড ও অর্ণবযান, পদার্থ বিদ্যা ও

বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি পক্ষে * * * * * * সাহায্য প্রদান করিতেছে। ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিদ্যার প্রভাবে মনের ক্ষুদ্রত্ব দূর হইয়া কি পর্য্যন্ত প্রশস্ততা লাভ হইয়াছে, তাহা স্বল্পকাল চিন্তা করিলে সহজেই প্রতীতি হইতে পারে। সর্ব্বপ্রথমে বর্ণপরিচয় অপরিজ্ঞাত ছিল বলিয়াই একে অন্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্মরণ রাখিতেন, তজ্জন্যই শ্রুতিশাস্ত্রের নামোদ্ভূত হয়। বর্ণজ্ঞান উপলব্ধি হওয়া অবধি অলক্তক দ্বারা তৎসমুদয় ভূর্জ্জপত্রে এবং তালপত্রে লিপিবদ্ধ হইত। তদুন্নতি পক্ষে এক্ষণে কাগজ, মসী ও মুদ্রা-যন্ত্র সাহায্য প্রদান করিতেছে। * * * সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ চন্দ্র কাল্পনিক পৌত্তলিক মত রূপ রাহু দ্বারা কবলিত হইয়া এক্ষণে ক্রমে ক্রমে অস্মদ্দেশে কি প্রকারে সেই গ্রাস পরিত্যক্ত হইয়া উহার বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে! * * * * যেমন কোন গ্রন্থ প্রচার সময়ে বিশেষ রূপ আদৃত হইবার জন্য কোন সুবিখ্যাত জগন্মান্য গ্রন্থকারের নাম দেওয়া হইয়া থাকে, ব্রহ্মার বেদ প্রকাশ করাও ঠিক সেইরূপ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি ব্রহ্মারই বেদ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে চন্দ্র, সূর্য্য সদৃশ জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে সর্ব্বস্থানব্যাপক গ্রন্থ অবশ্যই প্রচার করিতে পারিতেন।"

ইহার পরে আছে যে ব্রহ্মা যে সেরূপ গ্রন্থ প্রচার করেন নাই—তাহা নহে, মানবের মনই সেই মহাগ্রন্থ।

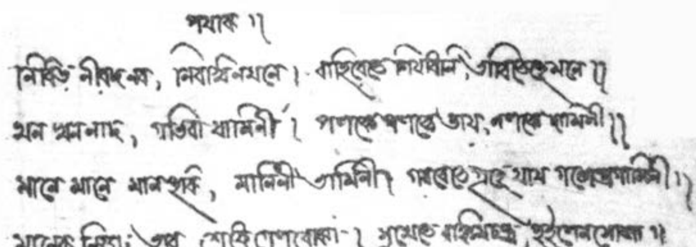
পিতৃদেব দিনাজপুরের একখানি মৌলিক ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তাহা ছাপা হইলে ২।৩ শত পৃষ্ঠা হইত। সেই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আমারই অবহেলায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মুদ্রিত দুইখানি বইএর বহু খণ্ড আমাদের বাড়ীতে ছিল, আমি যখন 'এন্সে' ক্লাসে পড়ি—তখনও সেগুলি ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তখন আমি সেগুলির প্রতি কোনরূপ যত্ন দেখাই নাই। পিতৃদেব কখনই ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না, কিন্তু এই সকল পুস্তক যখন আমারই অনবধানতায় প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তখন একদিন বলিয়াছিলেন, "এগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছ, কিন্তু এক সময়ে হয় ত খুঁজ্‌বে—তখন

পাইবে না।" তাঁহার আশঙ্কা ফলিয়াছে, আমি অনেক অর্থব্যয় করিয়া বহু চেষ্টায় ও মুদ্রিত "ব্রহ্মসঙ্গীত রত্নাবলীর" এক খণ্ড পুস্তক এমন কি একখানি পত্রও সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ব্রাহ্মধর্ম্মে একান্ত অনুরাগী হইয়াও তিনি নবযৌবনে একটি সরস্বতীর স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে। স্তোত্রটি এই :—

"সারদে বরদে বাণী সারদ্বতী বীণাপাণি,
তার মাগো সর্ব্বপ্রাণী, ভবভয়ভঞ্জিনী।
মণ্ডিত মল্লিকামালা, দশদিক্ করে আলা,
ভুবনমোহিনী বালা, সর্ব্ব মনোরঞ্জিনী।
জগদাদ্যা প্রকৃতি সতী, অগতি জীবের গতি।
ত্বংহি মাতা ভগবতী, গিরিরাজনন্দিনী
কোমলাঙ্গী শিতচ্ছবি, উজ্জ্বলা জিনিয়া রবি,
চরণাবনত কবি, সুররাজনন্দিনী।
সপ্তাশ্ব রাগিণী রঙ্গে, তালমান কুপ্রসঙ্গে
অমরঅমরী সঙ্গে, নৃত্যগীতরঙ্গিণী।
আসরে আসিয়া উর, অজ্ঞানের আশা পূর,
সুরেশ্বরী মহাশূর হরিহর সঙ্গিনী।"

তখন ঢাকাজেলার তেঁতুলঝোরা নিবাসী ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় সেকালের ডিপুটি ছিলেন, তিনি নব্যতন্ত্রী ; ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার এরূপ আস্থা ছিল এবং সমাজসংস্কারে তিনি এরূপ উদ্যোগী ছিলেন যে, তিনি তাঁহার বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন। এই ঘটনা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের অন্যতম ফল এবং সমাজের প্রাথমিক সংস্কার চেষ্টা। সম্প্রতি ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের যে বৃহৎ জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে আমার পিতৃদেবের



পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেনের বাং ১২৬২ সনের হস্তাক্ষর।

নাম আছে এবং তাঁহার সহিত যে ব্রজসুন্দর বাবুর সর্ব্বদা পত্র-ব্যবহার চলিত, তাহারও উল্লেখ আছে। ব্রজসুন্দর বাবু ঢাকায় নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। পিতৃদেবের আর একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ 'সদ্ভাব শতকে'র কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। ইনি আমাদের সুয়াপুর গ্রামের অভয়শঙ্কর সেন মহাশয়ের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র জীবনের উত্তমকালে ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন। 'সীতার বনবাসে'র কবি নবসমাজের বিশিষ্ট শ্রদ্ধেয় হরিশচন্দ্র বাবু পিতৃদেবের অন্যতম সুহৃদ্।

পিতৃদেব তাঁহার পিতার নিকট ফার্শী শিখিয়াছিলেন, আমার মাতামহের বাড়ীতেও ফার্শীবিদ্যার খুব প্রচলন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের হাতের লেখা একখানি ফার্শী কাগজ আমার নিকট ছিল, তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। ঐ কাগজখানি ধামরাই গ্রামবাসী ময়ুরভঞ্জ ষ্টেটের ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বসু বিএ, বিএল, মহাশয় আমাকে দিয়াছিলেন।

পিতৃদেব ইংরাজীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সে আমলে লোকে এডিসনের স্পেক্‌টেটার, জন্‌সনের র‍্যামব্লার এবং রাসেলাস, লাইফ অফ এম্পারার চার্লস দি ফিফ্‌ত, এ্যালেকজাণ্ডার পোপ, গোল্ড-স্মিথ ও ড্রাইডেনের কবিতা—এই সব পুস্তক বেশী পড়িতেন। ঈশ্বরচন্দ্র এই সমস্ত পুস্তক খুব ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকাগারে তাঁহার নিজ হাতের নোটশুদ্ধ এই সকল পুস্তক আমি ছোটকালে দেখিয়াছি।

তিনি ইংলিশম্যান প্রভৃতি পত্রিকায় সর্ব্বদা প্রবন্ধ লিখিতেন, এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালায় দাঁড়াইয়া অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। সেকালের ব্রাহ্মসমাজে ততটা গোড়ামি ছিল না। এইজন্য ঈশ্বরচন্দ্র

সমাজে দীক্ষিত না হইলেও ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে উপাচার্য্য হইয়া বেদীর উপর হইতে বক্তৃতা করিতেন। ঢাকার তখনকার প্রকাশিত কোন কোন সংবাদপত্রে তাঁহার বক্তৃতাগুলি প্রায়ই প্রকাশিত হইত। সেই পত্রিকাগুলি আমি শৈশবে ঘুড়ি বানাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলাম। জীবনে একদিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। মাণিকগঞ্জের একজন সর্ব্বজনপ্রিয় মুন্সেফ স্থানান্তরিত হওয়ার সময় তাঁহাকে বিদায় দেওয়ার উপলক্ষে মহতীসভার অধিবেশন হয়, তখন তিনি যেরূপ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তাঁহার বন্ধুর গুণগরিমা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা সহজ সরলভাবে কথা বলার মত ছিল না—তাহা বড় বড় সমাসবদ্ধ পদাড়ম্বরে উদ্দীপনাময় হইয়া উঠিত, কোন স্থানে যতিভঙ্গ বা তালভঙ্গ হইত না। সমানভাবে ওজস্বিতা রক্ষা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিয়া শেষে সপ্ততন্ত্রীর তান যেরূপ ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পড়ে, সেই ভাবে শেষ হইত।

পিতৃদেবের আর এক প্রিয়বন্ধু ছিলেন, নবকান্ত চক্রবর্ত্তী। ইনি বহুকাল ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব করিয়া কয়েক বৎসর হইল স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। ইঁহার এক কন্যাকে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিবাহ করিয়াছেন। ধামরাই স্কুলে পিতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং নবকান্ত বাবু দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজ করিতেন। পরম শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রীর মুখে আমি পিতার প্রশংসা-সূচক অনেক কথা শুনিয়াছি। ঢাকায় পিতৃদেব কয়েক বৎসর ওকালতি করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ পশার হয় নাই। তিনি সর্ব্বদা থিওডোর পার্‌কারের গ্রন্থ লইয়া থাকিতেন, মক্কেলের কাজের দিকে বিশেষ কোন দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার আদর্শ-জীবন ছিল সচ্চরিত্র দরিদ্রের জীবন। বড় লোকদিগের ব্যাভিচার-দুষ্ট সংসর্গ তিনি ঘৃণা করিতেন। কিছুদিন পরে তিনি ধামরাই স্কুলের

প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন, ১৮ বৎসর তিনি এই শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

এই শিক্ষকতাকালে তিনি ধামরাই স্কুলটি ঢাকা-বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। ইহাঁর ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই কৃতী হইয়া দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ষ্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান মিষ্টার অম্বিকাচরণ সেন মহাশয় আমার নিকট জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে খুল্লতাত ছিলেন। ইনি পিতার আশ্রয়ে থাকিয়াই ধামরাইস্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। পিতাই তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে মত লওয়াইয়াছিলেন। ইনি যখন পিতৃদেবের কথা বলিতেন, তখন মনে হইত, তাঁহারই চরিত্র ও সাধু জীবনের আদর্শ অনুকরণ করিতে তিনি প্রয়াসী ছিলেন। পিতার আর এক ছাত্র স্বনামধন্য ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "পিতার প্রভাব তাঁহার সমস্ত ছাত্রের জীবনেই কোন না কোন রূপে লক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু আপনি এরূপ গোঁড়া হিন্দু রহিয়া গেলেন কিরূপে?" তিনি বলিয়াছিলেন "আমিও তাঁহার প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলাম, শেষে মতি গতি ফিরিয়াছে।" তাঁহার আর দুই ছাত্র গৌহাটী জেলা কোর্টের সর্ব্বপ্রধান উকীল স্বর্গীয় দীননাথ সেন, এবং বাঁকিপুরের ভূতপূর্ব্ব উকীল ব্রজেন্দ্রকুমার দাস,—ইনি ওকালতিতে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেছিলেন, হঠাৎ বৃন্দাবনে গিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। পিতার জীবনের প্রভাব যে তাঁহার উপর বিলক্ষণ পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বহুদিন হইল তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন "তোমার পিতা আমারও পিতাই ছিলেন।"

সুয়াপুর বাসী স্বনাম ধন্য ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ান স্বর্গীয় কেদার নাথ রায়—যিনি 'আলো ও ছায়া'র কবি শ্রদ্ধাস্পদা কামিনী সেনকে বিবাহ

করেন, এবং যাঁহার তিন পুত্র এখন সিভিল সার্ভিস অলঙ্কৃত করিতেছেন, তিনি ও পিতার নিকট শৈশবে পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

পিতৃদেব রচিত দ্বিতীয় পুস্তকের নাম 'ব্রাহ্ম-সংগীত রত্নাবলী', ইহাতে রাজা রাম-মোহন রায়ের ভাবে অনেকগুলি ব্রহ্ম-সংগীত বিরচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকখানি আমার জন্মের অর্থাৎ (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের) দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। 'ব্রহ্মসংগীত রত্নাবলী' হইতে কয়েকটি গান নবকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ব্রহ্মসংগীত সংগ্রহের প্রথম সংস্করণে সঙ্কলিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রকাশিত দুইখানি পুস্তকই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সত্যধর্ম্মোদ্দীপক নাটকের কয়েকটী পত্র মাত্র আমার নিকট আছে।

অষ্টাদশ বর্ষকাল পিতৃদেব ধামরাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। মার্টিন, উড্রো ও অন্যান্য ইনস্পেক্টর সাহেবদের লিখিত তাঁহার সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রসংসাপত্র আমাদের গৃহে ছিল। তাঁহারা একবাক্যে পিতৃদেবের শিক্ষাপদ্ধতি ও স্কুলের সাফল্যসম্বন্ধে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

পিতৃদেব সম্বন্ধে মানিকগঞ্জের উকিল-সরকার আমার পূজনীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন :—"ঈশ্বরচন্দ্র ধামরাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, পরে কমিটি পাশ করিয়া এখানে উকীল হন। তাঁহার সময়ে তিনিই এক মাত্র ইংরেজী-জানা উকিল ছিলেন এবং বাঙ্গলা নবীশ উকিলেরা তাঁহাকে ঈর্ষা করিতেন এবং হাকিমেরা তাঁহাকে খুব সম্মান করিতেন। তাঁহার মক্কেলেরা তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিত।" বাঁকিপুরের প্রসিদ্ধ উকীল ৭৫ বৎসর বয়স্ক ব্রজেন্দ্র মোহন দাস এখন সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনে আছেন, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তিনি

পিতৃদেবের সম্বন্ধে একখানি সুদীর্ঘ পত্র ইংরেজীতে লিখিয়াছেন। তিনি পিতৃদেবের ঋণ যে ভাবে স্বীকার করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া স্বতই গৌরব বোধ করিতেছি—তাহা ভক্তের পুষ্পাঞ্জলী - কিন্তু তিনি যে সকল কথা লিখিয়াছেন—তাহার প্রায় সকল গুলি কথাই ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী মহাশয়ের পত্রে আছে; চন্দ্র-শেখর বাবু তৎসময়ের শিক্ষা দীক্ষার যে আনুসঙ্গিক চিত্র দিয়াছেন, তাহা, পূর্ব্ব-বঙ্গের অতীত সামাজিক-ইতিহাসের একখানি যথাযথ আলেখ্য, এই জন্য দীর্ঘ হইলেও পত্রখানি উদ্ধৃত করিতেছি।

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয় ও ধামরাই স্কুল।

আমার শিক্ষার সময় উপস্থিত হইলে শালকাঠের পীড়ার উপর খড়িমাটী দিয়া পিতৃদেব মহাশয় 'ক' 'খ' লিখিয়া দিতেন, তাহার উপর খড়িমাটী দিয়া মক্স করিতে করিতে কত গুলি বর্ণের লেখা ও নাম অভ্যস্ত হইল। পরে তালপত্রে লৌহশলাকা দিয়া বর্ণগুলি লিখিয়া দিতেন। এইরূপ লেখাকে "আঁচড়া" বলিত। আমরা মসীধারা ঐ সমস্ত 'আঁচড়ায়' লিখিয়া লিখিয়া মক্স করিয়া যাইতাম। শুষ্ক তালপত্র সহজে ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া যায় বিধায় উহা ব্যবহারের পূর্ব্বে গরমজলে সিদ্ধ করিয়া লইলে বহুকাল স্থায়ী হইত। সিদ্ধ করা তালপত্রে প্রাচীন সমস্ত পুথিই লিখিত হইত। তাহা অনেকের ঘরেই এপর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। তাল-পত্রে লিখা অভ্যাস হইলে কদলীপত্রে লিখিতে অভ্যাস করি। তৎপশ্চাৎ কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিলাম। এই অবস্থায় শিশুরা বলিত "আমি কাগজে উঠিয়াছি" অর্থাৎ কাগজে প্রমোসন পাইয়াছি। ইহা একটী উচ্চশ্রেণী। সেকালে অনেক গ্রামে এবং অনেক পাড়ায় একজন 'গুরুমশাই' পাঠশালা করিতেন। প্রাতঃকালে এই পাঠশালা বসিত এবং ৮টার সময় ছুটি হইত। পরে বৈকালে ৩।৪ টার সময় পাঠশালার কার্য্য হইত। প্রতিপদ এবং অষ্টমীতে এবং পর্ব্বদিনে ছুটি ছিল। সকল শিশুই বসিবার জন্য ছোট ছোট পাটী মাদুর 'ধাড়ি'—'মৌলা' ইত্যাদি এবং নিজের লিখার জন্য তালপত্র, কলাপত্র এবং দোয়াত-কলম সঙ্গে লইয়া যাইত।

পূর্ব্বে বাঁশের কলমেরই অধিক ব্যবহার ছিল, তাহাতে একটি পয়সাও ব্যয় হইত না। পরে ক্রমে খাগ, 'ওয়াম্বি-খাগ', ঢেকীলতা, ইত্যাদি কলম ক্রয় করিতে হইত। তন্মধ্যে 'ওয়াম্বি-খাগে'র কলমই মূল্যবান; বড় বড় জমীদার এবং মহাজনেরাই ইহা ব্যবহার করিতেন, এবং এই কলম দেশী কর্ম্মকারের প্রস্তুতী ছুরী দিয়াই কাটা যাইত। পরে 'সোয়ানের পেন' 'রাজ হাঁসের পেন' এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে রজর্সের ছুরী (Rogers) আমদানী হইয়া পড়িল। তৎপর 'নিব' 'হেণ্ডেল' ইত্যাদি আমদানী হইল। ইহাতে সামান্য লেখনীর জন্য—যাহার জন্য একপয়সা ব্যয় ছিল না—তাহারই জন্য ভারতবর্ষ লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশের পায়ে ঢালিয়া দিতেছে। পূর্ব্বে জমিদারদের, মহাজনদের খাতা ও অন্যান্য দলিলপত্র ইত্যাদির লিখন সময় বালি দ্বারা 'ব্লটিং'এর কাজ চলিত এবং তাহাতে কালীর অক্ষর ঠিক থাকিত, এমন সহজ-লভ্য মূল্যহীন 'ব্লটিং'এর (বালির) পরিবর্ত্তে ব্লটিং কাগজ আসিয়া বহু টাকা নিয়া যাইতেছে।

গুরুমহাশয়ের পাঠশালা খোলা যায়গায় পত্রপূর্ণ বৃহৎ বৃক্ষতলে বসিত। আমাদের পাঠশালায় স্বর্গীয় রামনাথ মালাকারদের বকুল তলার নীচে বসিত। আমরা মৃত্তিকার উপর ছোট ছোট পাটী বিছাইয়া লিখাপড়া করিতাম। এতাদৃশ খোলা বাতাসে শিক্ষা (open air teaching) অতি স্বাস্থ্যকর ও স্ফূর্ত্তিপ্রদ ছিল। তাহার সুফল আমরা এখনও ভোগ করিতেছি। প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জ অর্থাৎ এই লর্ড হার্ডিঞ্জের ঠাকুরদাদা এদেশে বড়লাট হইয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই বাঙ্গালার অনেক স্থানে বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহাতে ধামরাই একটী ছাত্রবৃত্তি স্কুল স্থাপিত হয়। তাহাতে শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ নিবাসী স্বর্গীয় কৃষ্ণগোবিন্দ দে মহাশয় সর্ব্বাগ্রে শিক্ষক হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে 'মাষ্টার মশাই' বলিয়া ডাকিতাম। ক্রমে রোয়াইলের শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী মহাশয় এবং সুয়াপুরের ঈশ্বরচন্দ্রসেন মহাশয় এবং বিক্রমপুর আউটসাহীর আনন্দপণ্ডিত মহাশয় এবং জপসার প্রসিদ্ধ বৈদ্যসরকার-বংশোদ্ভব হাইকোর্টের উকীল প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের পিতা দীননাথ সেন মহাশয় আমাদের এই গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক হইয়া আসেন। এই ধামরাই স্কুলটী ঢাকা জেলার মধ্যে প্রায়ই ১ম, ২য় ইত্যাদি ভাবে উচ্চ স্থান অধিকার করিত।

স্কুলের ছাত্রেরা শিক্ষক মহাশয়দিগকে বিশেষ ভক্তি ও ভয় করিত। শিক্ষক-মহাশয়েরাও ছাত্রদিগকে বিশেষ স্নেহ ও যত্নের সহিত তাহাদের উন্নতিকল্পে সদুপদেশ ও শিক্ষা দান করিতেন। অনেক সময় তাঁহারা সানন্দে ক্রীড়া কৌতুক এবং গল্প-চ্ছলে তাহাদের সহিত সময় কাটাইতেন। আমরা অসময়ে রাস্তায় খেলা আরম্ভ করিলে সেই সময় রাস্তায় কোনও শিক্ষক মহাশয়কে দেখিলে ছুটিয়া পালাইয়া যাইতাম। কৃষ্ণ-গোবিন্দ মাষ্টার মহাশয় একটু কড়া ছিলেন, কোনও ছাত্র তাঁহার নিকট পড়িলে তাহাকে ধমকাইয়া বা কান মলিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেন।

প্রথমে ধামরাই স্কুলের নিজস্ব কোনও ঘর ছিলনা। ৺ঠাকুর মাধবের যাত্রা বাড়ী অর্থাৎ গুঞ্জ বাড়ীতেই স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। ঈশ্বর বাবুর যত্নে পরে থানার পুকুরের উত্তর পাড়ে খড়ের ছাউনী সহ এক প্রকাণ্ড আটচালা প্রস্তুত হইল। তাহার মেজে ও দেওয়াল কাঁচা মাটীর নির্ম্মিত ছিল। ভুইমালী নামক একজাতীয় লোক আছে তাহারা মাটী কাটে, ভিটা বাঁধে, দেওয়াল দেয়, ঘর নিকায়। ভুইমালী দ্বারাই মেজে দেওয়াল ইত্যাদি নির্ম্মিত হইয়া ছিল। ঘরের মেজেতে সময় সময় অত্যন্ত ধুলা হইলে আমরা কথিত পুকুর হইতে ভাঁড়ে ভাঁড়ে জল আনিয়া মেজে নিকাইয়া দিতাম, তখন আমাদের আনন্দ-স্ফূর্ত্তি কত! ঐ সময় মাষ্টার মহাশয়রাও একটু একটু উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন, তাহাতে আমাদের উৎসাহ আরও বর্দ্ধিত হইয়া যাইত। শ্রদ্ধাস্পদ ঈশ্বর চন্দ্র সেন মহাশয় তখন আমাদের হেড্ মাষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। তিনি ইংরাজী বাঙ্গালা যেটুকু পড়াইতেন তাহা ছাত্রদিগের হৃদয়ে গাঁথিয়া থাকিত। ফুল ও ফল বাগান করিতে তাঁহার নিতান্ত সখ ছিল। স্কুলের চতুর্দ্দিকে অনেক জমি ছিল। তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমরা জঙ্গল কাটিয়া ঐ সমস্ত স্থান পরিষ্কার করিলাম। সেই স্থানে আবশ্যক মত বেড়া দিয়া তাহাতে অনেক প্রকার ফুলের গাছ রোপন করা হইল। ঈশ্বর বাবু সুয়াপুরে নিজের বাড়ীতেও আম লিচু ইত্যাদি অনেক প্রকার ফলের গাছ এবং ফুল গাছ রোপন করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার বাড়ীখানি সুস্নিগ্ধ ছায়াময় নির্জ্জন ছিল। যেদিন আমরা তাঁহার বাড়ীতে প্রথম প্রবেশ করিলাম, তখন মনে হইল যেন কোনও মুনি-নিকেতনে প্রবেশ করিয়াছি। ঈশ্বরবাবুর স্ত্রী অতি স্নেহময়ী ছিলেন। তাঁহার আদর ও স্নেহে যে কত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা এখনও

স্মৃতিতে উপস্থিত হইলে বিশেষ আনন্দ উদ্ভূত হয়। এথায় ভগবানের একটী আশ্চর্য্য খেলার কথা উল্লেখ যোগ্য। হেড মাষ্টার ঈশ্বরবাবুর একটী গাভী ছিল, গাভীটীর ষাঁড় বাছুরই প্রসব হইত। এবং তাঁহার স্ত্রীরও কন্যা সন্তানই জন্মিত। এইরূপে অধিক পরিমাণে কন্যা সন্তানই হইল, তথনও তাঁহার কোনও পুত্র সন্তান জন্মে নাই। এই রহস্যের মর্ম্মকথা বিধাতা পুরুষ ছাড়া কে বলিবে? গাভীটী যেবার মাদী বাছুর প্রসব করিল, সেইবারেই আমাদের স্নেহাস্পদ শ্রীমান দীনেশ চন্দ্র সেন ভায়ার জন্ম হইল। দীনেশ বাবুর চেহারা মুখের গঠন, বর্ণ, চক্ষু, চাহনি, হাস্য ঠিক পিতৃ অনুরূপ হইয়াছে। দীনেশবাবুর পিতা পূর্ব্বে বঙ্গের বৈদ্যদিগের মধ্যে বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন কুলীন। তিনি তৎকালীয় ঢাকার গভর্ণমেণ্ট উকীল বগজুরী নিবাসী ৺ গোকুল মুনসী মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নী পরমা সুন্দরী গৌরবর্ণা, ক্ষীণাঙ্গী ছিলেন। সর্ব্বদাই সস্মিত বদন ছিল; সংসারের গৃহ কার্য্যাদি নিজেই সমাধা করিতেন। তাঁহার শরীর আবরা বেশ সুস্থ দেখিয়াছি। সে কালে এমন কি ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বেও পূর্ব্ববঙ্গে স্ত্রীলোকেরা কপালে এবং নাসিকায় গোধানী অর্থাৎ উলকী লইতেন। তখন উহা এক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির একটী পাকা চিত্র মধ্যে গণ্য ছিল। তাঁহারও কপালে এবং নাসিকায় উল্‌কী ছিল। ঈশ্বর বাবু অনেকদিন সপরিবারে ধামরাই রামগতি কর্ম্মকারের বাড়ীতে বাসা করিয়াছিলেন। তখন সর্ব্বদাই আমরা তথায় যাইতাম। আমার মা ছিলেন না বলিয়া তাঁহার স্ত্রী আমাকে অধিকতর স্নেহ করিতেন। একবার তাঁহাদের সুয়াপুরের বাড়ীর বাগানের নিচুফল আমাদিগকে খাইতে দিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আমরা কখনও নিচুফল দেখি নাই। উহা খাইয়া অপূর্ব্ব পরিতৃপ্তি পাইলাম। আমাদের গ্রামে তখনও নিচুগাছ ছিল না। তিনি মাঝে মাঝে আমার মুখে রামায়ণ কীর্ত্তনিয়াদের ২।৪টী পদ শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন এবং নাচিয়া নাচিয়া উহা গাহিতে বলিতেন। আমার কোনও কালেই সুর ও রাগিণী নাই। তবুও তিনি আমাকে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে গাহিতে বলিতেন। তাঁহার নাম ছিল রূপলতা, তিনি রূপে, গুণে ও স্নেহে, দেবী ও জননী বিশেষ ছিলেন।*

* চন্দ্রবাবু স্ত্রীপ্রত্যয় সাঁ, তস্য প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন, আমি সাঁ স্থলে 'তিনি' 'তস্যার' স্থলে 'তাঁহার' লিখিয়াছি।

ইহার পরে হেড মাষ্টারবাবু, আনন্দপণ্ডিত মহাশয় ও সেকেণ্ড মাষ্টার দীননাথ সেন মহাশয়ের সহিত বাজারের প্রান্তে বাসা করেন। উহা পূর্ব্বে বালিয়াটীর ৺জগন্নাথবাবুর কাছারী-বাড়ী ছিল। তাহার পাশেই গোয়ালাদিগের বাড়ী। আমরা পাঠ বলিয়া লইবার জন্য কয়েকটি বালক তথায় প্রাতে যাইতাম। এবং তাঁহাদের প্রাতের রান্নার অসুবিধা হইলে, কালীচরণ চক্রবর্ত্তী নামক একটী ব্রাহ্মণ বালক তাঁহাদের নিকট থাকিতেন, তিনিই রান্না করিতেন। তাঁহার অসুখ হইলে, আমরা রান্না বান্না করিয়া দিয়া আসিতাম। কথিত কালীচরণ চক্রবর্ত্তী সদ্বংশজাত এবং সৎস্বভাবান্বিত ব্রাহ্মণ বালক। ৺রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের 'শিল্প-দর্শন' পাঠ করিয়া ভাল সোরা প্রস্তুত করিবার শিক্ষা পাইলাম। তাহাতে লিখা ছিল, গোয়াল ঘরের মেজেতে শীতকালে লবণের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জন্মে। উহা সোরা নামক পদার্থ (Solt setre) ইহা চাঁচিয়া সংগ্রহ করিয়া লইতে হয় এবং জলে কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ধোপারা যেমন করিয়া ক্ষারের জল বস্ত্র মধ্যে বাঁধিয়া টেপাণ ফেলিয়া প্রস্তুত করে, সেইরূপে সোরার জল ও প্রস্তুত করিতে হয়। এই টেপান জল যত মাটী শূন্য ও পরিষ্কার হইবে ততই সোরা পরিষ্কার দেখাইবে। নিকটস্থ গোয়ালাদের গোয়াইল হইতে আমরা ঐ সোরা সংগ্রহ করিলাম। এবং তাহার জল কথিত প্রকারে টেপাণী ফেলিয়া প্রস্তুত করা হইল। রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয় লিখিয়াছেন, কাঠের পরিবর্ত্তে আম পাতার জ্বালে অতি উৎকৃষ্ট সোরা তৈয়ার হয়; সোরার কলমগুলি মোটা এবং সুদীর্ঘ হয় এবং বর্ণও পরিষ্কার হইয়া থাকে। আমরা তাঁহার উপদেশানুযায়ী আমপাতার জ্বাল দিয়া যে সোরা প্রস্তুত করিলাম তাহা ফলতঃ অতি উৎকৃষ্ট হইল। সোরা বিক্রেতারা বলিল এরূপ উচ্চাঙ্গের সোরা বাজারে কমই পাওয়া যায়। মাষ্টার মহাশয়েরা আমাদের এই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বিশেষ উৎসাহ দিলেন। এই সোরা দিয়া যে বারুদ প্রস্তুত করিলাম তাহাও উৎকৃষ্ট হইল। ইহা বন্দুক-ব্যবহারে চীনা বারুদের ন্যায় কাজ করিত। মাষ্টার মহাশয়দের বাসায় অনেকপ্রকার ক্রীড়া কৌতুকের স্থানও ছিল, এবং সখের ভোজনের আড্ডাও ছিল। সে কালে আমাদের গ্রামে সন্দেশাদির দোকান ছিল না, গোয়াল বাড়ী হইতে 'মালাই' কিম্বা ক্ষীর আনিয়া চিড়াসহ ভোজন করিতাম। একদিন ঐরূপ ক্ষীর চিড়া মাখিয়া সকলকে পৃথক্ পৃথক্

ভাবে বণ্টন করিয়া দিয়াছি। ইতিমধ্যে আমাদের একটি ব্রাহ্মণ-সহপাঠীর তাহার ভাগেরটা খাইয়া ফেলিয়া, একটী শূদ্র সহপাঠীর ভাগ হইতে খানিকটা নিয়া খাইয়া ফেলিল। তখন আমরা তাহাকে বলিলাম "তুমি শূদ্রের পাতেরটা খাইয়াছ আমরা বাড়ী গিয়া বলিয়া দিব। ব্রাহ্মণ বালকটী তোতলা ছিল। সে রাগিয়া বলিল "যা-যা-যাও-ব-ব-ব-লে দিয়া কি-কি-কি-করবে? আ-আ-আ-আমি ব্রাহ্ম।" আমরা সকলেই তাহার বাক্যে হাসিয়া বিশেষ আমোদ পাইলাম। খাদ্যাখাদ্যের বিচার না থাকিলেই তাহাকে লোকে ব্রাহ্ম বলিত।

সেকালে কোনও ইংরাজী বইএর মানের বহি ছিল না। ইংরাজী বাঙ্গলা একখানা অভিধান বাহির হইয়াছিল তাহাতে ইংরাজী মানে পাওয়া যাইত না। জনসন পকেট ডিকসনারী নামক অতি ক্ষুদ্র লিখাযুক্ত একখানি অভিধান হইতে ইংরাজীর ইংরাজী মানে আমরা সংগ্রহ করিতাম। আমরা মানে লিখিয়া না নিলে মাষ্টার মহাশয়েরা পড়া বলিয়া দিতেন না। সুতরাং আমাদের সকলকেই ঐ প্রকার ডিক্সনারী হইতে মানে লিখিয়া প্রস্তুত হইয়া যাইতে হইত। মন্ত-নিবাসী অম্বিকাচরণ সেন নামক একটী বালক ঈশ্বরবাবুর সম্পর্কিত ভাই তাঁহার বাসায় ছিলে। সেই বালকটি ঐ স্থানে সংগ্রহ করিয়া লিখিতে বিশেষ আলস্য করিত না। আমরা তাহার দ্বারা মানে লেখাতে বিশেষ সাহায্য পাইতাম। অম্বিকা চিরদিনই সুনিপুণভাবে লিখা-পড়া করিত। এবং আমরাই স্কুল হইতেই অম্বিকা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ১ম হইয়া তিন টাকা বৃত্তি পাইয়া ঢাকা কলেজে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিল। এবং সেই ঢাকা কলেজ হইতে বি, এ, পাশ হইয়া কলিকাতায় বিজ্ঞানে এম, এ, পাশ করিল। পরে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ষ্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান করেন। অম্বিকাই এদেশে সর্ব্ব প্রথম ষ্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান। এই অম্বিকাবাবুর উন্নতির প্রকৃত মূলই আমাদের ঈশ্বরবাবু।

ঈশ্বরবাবু তত্ত্ববোধিনী নামক পত্রিকায় গ্রাহক ছিলেন। *

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ টান ছিল। তখন বড় মানুষ মাত্রেই বিবাহাদি ক্রিয়া কর্ম্মোপলক্ষে বাই খেমটা নাচের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। শ্রদ্ধাস্পদ ঈশ্বর বাবু তাদৃশকার্য্যে বিশেষ ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন এবং সেইজন্য একটী পুস্তিকা ছাপাইয়াছিলেন। পুস্তকখানির নাম আমার মনে নাই। তাহাতে বাঈ-খেমটা নাচের বৈঠকের যে একটী দৃশ্য বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। তিনি লিখিয়াছেন—"নাচের বেলায় বাঁয়া তবলার "চাটিতে" যে বোল উঠে তাহা "ধিক্কার" "ধিক্কার" বলিতেছে, সারেঙ্গ 'কোন্' 'কোন্' জিজ্ঞাসা করিতেছে, খেমটাওয়ালী হাত নাড়িয়া বলিতেছে—"ইয়া বাবু লোককো," "বাবুলোককো।"

খামরাইর অনেকেই শ্রদ্ধাস্পদ ঈশ্বরবাবুর ছাত্র। পাটনার অন্যতম প্রধান উকিল ব্রজেন্দ্রমোহন দাস যিনি বহু টাকা উপার্জ্জন করিতে করিতে ব্যবসা ছাড়িয়া প্রায় ২৫ বৎসর হইল ৺ শ্রীবৃন্দাবন যোগী-জীবন যাপন করিতেছেন, তাহার ভ্রাতা ৺ মনোমোহন দাস (গাজীপুরের Civil Surgeon) ঢাকা জগন্নাথ কলেজের Superintendent শ্রদ্ধাস্পদ অনাথবন্ধু মল্লিক মহাশয় প্রভৃতি আমরা অনেকেই তাঁহার ছাত্র। তিনি আমাদিগকে ঢাকা কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর Standard পর্য্যন্ত পড়াইয়া দিতেন। আমাদের সময় ছাত্রবৃত্তির সাহিত্যের অন্তর্গত রত্নাবলী নামে একখানা গ্রন্থ ছিল।

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার খসড়টা তাঁহার কাগজ পত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। তাহা এই—

মান্যবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক মহাশয়েষু

সবিনয় নিবেদন মিদং—

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করিয়া প্রতিমাসে চারি আনা দাতব্য দিতে শীকার করিলাম। সভা প্রবেশ দক্ষিণা এক টাকা প্রেরণ করিতেছি। ইতি ১৩ই পৌষ ১৭৭৫" এই ১৭৭৫ অবশ্যই শকাব্দ, তাহা হইলে ইংরাজী ৮৫৩ খৃঃ অব্দে এই চিঠি লেখা হইয়াছিল—গ্রন্থকার।

গ্রন্থখানি Self help নামক একখানি ইংরেজী গ্রন্থের স্বাধীন অনুবাদ। ঈশ্বর বাবু আমাদিগকে ঐ গ্রন্থখানি এমনভাবে পড়াইয়াছিলেন যে, তাহা হইতে সাহিত্য শিক্ষা নীতিশিক্ষা এবং কর্ম্মশিক্ষা যেরূপ পাইয়াছি তাহা আমাদের চির জীবনের সাথী হইয়া রহিয়াছে।

এই রত্নাবলী পুস্তকখানা পাঠ করিয়াই আমার নবজীবন উদ্ঘাটিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বাল্যকালে পুস্তক পাঠ আদিতে আমার মন পড়িত না। শিল্প কর্ম্মের উপরই আমার মন বেশী যাইত। আমি দুই বার বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তিতে ফেল হই, পরে ৺লক্ষী জনার্দ্দনের কৃপায় এবং ঈশ্বর বাবু এবং দীননাথ সেন মহাশয়ের যত্নে আমার মত মূর্খ সেবারকার বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ঢাকা সার্কেলের মধ্যে প্রথম হইয়া ৪ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলাম। তখন ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, চট্টগ্রাম, নওয়াখালী, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ এবং পাবনা ইত্যাদি এই সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। দীননাথ সেন মহাশয়ের যত্নে আমরা ক্ষেত্রতত্ত্ব ও অঙ্ক যাহা শিখিয়াছিলাম তাহার পন্থা অতি সরল এবং আনন্দপ্রদ ছিল। অধিকাংশ স্থানে শিক্ষকের শিক্ষাপ্রণালী, যত্ন, ভালবাসাতে অনেক মূর্খ ছাত্র মনুষ্য জীবন লাভ করে তবে ২।৪টি মাত্র অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালক নিজের চেষ্টায় উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহাও জানি।

বালককাল হইতেই আমার হৃদয়ের বাসনা ছিল আমি ডাক্তার হইব। অনেক ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহাতে হতাশ প্রায় হই; কিন্তু মা ইচ্ছাময়ী জীবের প্রকৃত ইচ্ছা জানিলে কালে তাহা পূর্ণ করিয়াই থাকেন। তাই আমার মত মূর্খ লোক কলিকাতায় একটী চিকিৎসক মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

প্রত্যেক বালকেরই ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কি করিবে তাহার লক্ষ্য স্থির থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার পথ পাইবে; কিন্তু আমাদের দেশে সকলেই স্রোতের মুখে গা ঢালিয়া দেয়। ইউরোপ আমেরিকার প্রত্যেক বালকই আপন লক্ষ্য স্থির করিয়া লয় এবং নিজ নিজ অভিভাবক দ্বারা লক্ষ্য স্থলে যাইবার উপায় করিয়া লয়।

আমাদের সৌভাগ্য শক্তিকে মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র সেন এবং দীননাথ সেন প্রভৃতি মহোদয়ের মত শিক্ষাগুরু আমরা পাইয়াছিলাম। এক্ষণ জানিতে পাই অনেক শিক্ষক মহাশয়রাই ছাত্রদের সহিত সেরূপ স্নেহ মমতা রাখেন না।

ওকালতীর পদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাস্পদ ঈশ্বরবাবু যখন ধামরাই ছাড়িয়া যান, তখন তাঁহার জন্য সমস্ত ছাত্রবৃন্দ এবং অভিভাবকেরা কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছিল। তাহাতে ছাত্রেরা সভা করিয়া অনেকেই তাহার সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা পাঠ করে। আমার রচনা টুকুতে লিখিয়াছিলাম যে—"জন্মদাতা পিতা অপেক্ষাও জ্ঞানদাতা ও শিক্ষাদাতা শ্রেষ্ঠতর।

পিতৃদেবের অপর এক ছাত্র শ্রীযুক্ত হরিমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে আছেন। তিনি এখন অতি বৃদ্ধ, এবং "নোলক বাবাজি" নামে পরিচিত হইয়া বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তির গুরুরূপে পূজা পাইতেছেন। তাঁহার বাড়ী ও ধামরাই গ্রামে।

আমার পিতামাতার বহুকাল যাবৎ কেবল কন্যাই হইতেছিল। আমার জন্মের পূর্ব্বে নয়টি কন্যা হইয়াছিল। তাহাদের ছয়টি শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমার প্রথমা ভগিনী দিগ্বসিনী দেবীর বিবাহ খুব সম্পন্ন গৃহে হইয়াছিল। তাহার শ্বশুর দেওয়ান গৌরমোহন রায় আমাদের সে অঞ্চলের একজন বড় লোক ছিলেন। অপরা ভগিনী বসন্তবালার বিবাহ ও গ্রামের জমিদার ৺ভারতচন্দ্র দাস মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত দক্ষিণা-রঞ্জন দাসগুপ্তের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। ইহাঁদের অবস্থা ও বেশ ভাল ছিল। তৃতীয়া কন্যা বগলা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, বায়রা গ্রামবাসী ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ণচন্দ্র রায়। তখন তিনি সবে ডিপুটি হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন। প্রথমা ভগিনীর স্বামী ব্রজমোহন রায় অল্প বয়সে কলেরা রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন। একটি কন্যা লইয়া দিদি আমাদের সংসারে আগমন করেন, এবং প্রায় চির-জীবনটা আমাদের সংসারে অতিবাহিত করেন। তৃতীয়া বগলা দেবী ১৬ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

নয়টি কন্যা হইবার পরে, আমার মাতার বহু মানতের ফলে, দেবগৃহে বহু ধন্না দেওয়া, মাছুলি ধারণ ও গ্রহ-শান্তির বহু ব্যবস্থা করার ফলে হউক, কিম্বা কোন একটা দুঃসহ দুঃখ জগতে প্রবেশ করিবার হঠাৎ সুবিধা লাভের গতিকে হউক আমি আমার যমজ ভগিনী মগ্নময়ী দেবীকে সঙ্গে লইয়া মাতুলালয় বগজুড়ী গ্রামে এক আম্রবৃক্ষ তলে আতুর ঘরে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। কার্ত্তিক মাসের ১৭ই, শক ১৭৮৮ শুক্রবার, রাত্রি তখন ৪ দণ্ড বাকী আছে। আমার পিতা তখন ধামরাই ছিলেন, তিনি পরদিন বেলা ১০টার সময় স্নান করিতেছিলেন, এই সময়ে বগজুড়ী হইতে প্রেরিত লোক তাঁহাকে আমার জন্মের খবর দিল। তিনি যে সিক্ত বস্ত্র খানি ছাড়িয়া ছিলেন এবং যে শুষ্ক বস্ত্র পরিতেছিলেন, উভয়ই, একটি কলসী যাহার জলে স্নান করিয়াছিলেন, ঘটিটি ও জল-চৌকীখানা, গামছা এবং যাহা কিছু সাম্‌নে ছিল, চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাহার সমস্তই সেই-সংবাদবহ লোককে দান করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

জন্মিয়াই তাঁহাকে এরূপ আনন্দ দিতে পারিয়াছিলাম কি গুণে? তাঁহাদের বংশে একটা মুষল হইল কি অলাবু হইল তাহা তো তাঁহারা জানিতেন না; তবু সারারাত্রি জাগিয়া আমার পিতামাতা আমার মুখ দেখিয়া কি আনন্দ পাইয়াছিলেন?—বোধ হয় আমাদের মধ্যে তাঁহারা আনন্দস্বরূপকে পাইয়াছিলেন. বোধ হয় সকল ছেলের মধ্যেই সেই আনন্দস্বরূপ থাকেন, যখন আমিত্ব প্রবল হইয়া সেই আনন্দস্বরূপকে আড়াল করিয়া ফেলে, তখন জীব ভগবানের সঙ্গে পৃথক হইয়া পড়ে।

পিতৃদেব পুত্র-লাভ বিষয়ে একবারে হতাশ হইয়া ধামরাই স্কুলের পদেই চিরজীবন কাটাইবেন, এই ইচ্ছা করিয়াছিলেন। "বেশী অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কি ফল হইবে? আমরা কাহার জন্য রাখিয়া যাইব?"



গ্রন্থকারের যমজ ভগিনী মগ্নময়ী দেবী।

এই কথা বলিতেন। মেয়েদের তখন সম্পন্ন ঘরেই বিবাহ হইয়াছিল। আমার মায়ের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া তাঁহার সর্ব্বদা তর্কযুদ্ধ চলিত ও ফলে তিনি অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত নিতান্ত উদাসীন ও নিশ্চেষ্টই রহিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু যে দিন আমার জন্ম হইল, সেই দিন, তাঁহার একটী নূতন কর্ত্তব্যের ভার পড়িল, ইহা মনে হইল; এবং অল্পকালের মধ্যেই ধামরাই স্কুলের পদ ত্যাগ করিয়া মানিকগঞ্জ মুন্সেফ-কোর্টের উকিল হইলেন।

আমার পিতা ও মাতা দুই ভিন্ন মতাবলম্বী এবং দুই ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। মাতা ছিলেন তেজস্বিনী, পিতা ছিলেন মৃদু-স্বভাব। মাতা ছিলেন অর্থ সম্পদের প্রয়াসী, পিতা ছিলেন অনাড়ম্বর এমন কি দারিদ্র জীবনের পক্ষপাতী। পিতা ছিলেন ব্রাহ্ম, মা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জিনিষ পত্র ও আসবাব সম্বন্ধে মা সাদা-সিধা ধরনের টেকসই দ্রব্যাদি পছন্দ করিতেন, বাবা জমকালো প্রাচীন জড়োয়া-পাড় বস্ত্রাদি এবং উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন শিল্প-যুক্ত কাংস্য, পিত্তল ও তামার জিনিষ পছন্দ করিতেন। মা অর্থ সঞ্চয় করিতে চাহিতেন, বাবা যে জিনিষ-পত্র দেখিতেন তাহাই কিনিতেন। পুরাতন জিনিষ কিনিবার তাঁহার একটা বিষম সখ ছিল। এই লইয়া প্রায়ই মাতার সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটিত। মাতার বহু নিষেধ সত্ত্বেও তিনি খুব চওড়া নানারূপ কারুকার্য্য ভূষিত শাল, তাহা যত পুরাণোই হউক না কেন,—নানারূপ চিত্র বিচিত্র খোদাই পুরাতন আলমারা ও খট্টা—যাহা হয়ত ব্যবহারে ক্ষয় পাইয়া গিয়াছিল—এইগুলি কিনিয়া কিনিয়া বাড়ী বোঝাই করিতেন। মা ইহার নিতান্ত বিরোধী ছিলেন, "এগুলির আয়ু দুই দিন, অনর্থক এদের পাছে টাকা নষ্ট করা কেন?"

বাবা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন "সেই শিল্প দুর্লভ শিল্প, এমনটি কি এখন কার দিনে হবার যো আছে ?" ইহাঁদের এ সম্বন্ধে মত কিছুতেই মিলিত না। একদিন বাবা আমাকে সাচ্চা জড়াও সিল্কের একটা মোগলাই পোষাক নীলামে কিনিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল, আমি সেইটি পরি, কিন্তু সেটি পরিলে আমাকে নবাব খাঞ্জার্খাঁর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের মত দেখাইত। তাঁহার বহু অনুরোধে আমি উহা পরিয়া একদিন স্কুলে গিয়াছিলাম ; তখন আমার বয়স দশ। আমার সহপাঠিরা আমায় দেখিয়া হাতে তালি দিল ঠাট্টা করিয়াছিল, এমন কি গিরীশ পণ্ডিতের অটুট গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গিয়া তাঁহার ও ঠোটের আড়ালে একটা পরিহাসের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বলা বাহুল্য, আমি ত সেই এক বারের পর তাহা আর পরি নাই, এখন মনে হয়, কেন পরিলাম না ! তিনি যে বেশে সাজাইয়া আমাকে দেখিতে আনন্দ পাইতেন, আমি কেন তাহার প্রতিকূল হইলাম ! সেই জামাটার সাচ্চা নক্ষত্রগুলি ও জড়াও পাড়, উইএ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল, বহু দিন আমি একটা সিন্ধুকে উইএর সেই ভুক্তাবশেষ দেখিয়াছি। একবার বাবা আমার জন্য একটা চোগা কিনিয়াছিলেন—সে ১৮৭৭ সনে হইবে। আমার মাসীমা তাহার বড় ছেলের জন্য একটা কিনিলেন। একটার লাল জমি—পশ্চাৎভাগে বহু বিস্তৃত সাচ্চা কাজ, সম্মুখ ভাগ ও কণ্ঠের দিকে ও নানা সাচ্চা কাজে ঝলমল, সেটি ছোট, ১০ বৎসরের বালকেরই যোগ্য। আর একটা প্রমাণ সাইজ, সাদা জমি, পশমের তোলা ধারে ধারে কিছু কিছু কাজ আছে। আমার দাদার জন্য মাসীমা এই শেষোক্তটি কিনিলেন। হাতের দিক্‌টার মাঝে একটা সেলাই দিয়া সেই লম্বা জিনিষ দুটা গুটাইয়া ফেলিয়া কোট্‌টা দাদা তখনই ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং এখন পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৪৩ বৎসর পরে ও বোধ হয় সেটি ব্যবহার করিতেছেন,

তাহার হাত দুটির মাঝের সেলাইটা অবশ্য এখন আর নাই। কিন্তু আমার জন্য বাবা সেই প্রথমটি কিনিয়া ছিলেন, তাহা ১০ম বর্ষ বয়সের পর আর ব্যবহার করিতে পারি নাই। দুইটির প্রত্যেকের দাম তখন ছিল ২৭৲ টাকা।

এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া মায়ের সঙ্গে বাবার সর্ব্বদাই অনৈক্য হইত। কিন্তু ঝগড়াটা এক হাতের তালি, বাজিয়া উঠিতে পারিত না। কারণ মা অনেক কথা শুনাইয়া দিতেন, বাবা চুপটি করিয়া শুনিতেন, যেন সেগুলি তাঁহাকে বলাই হইতেছে না। এই নীরব অনাস্লিষ্ট শ্রোতাটির উপর মায়ের রাগ ক্রমশ বাড়িয়া উঠিত। যখন ভাষা ক্রমশ উত্তেজিত ও কণ্ঠস্বর খুব উচ্চগ্রামে চড়িয়া উঠিত, তখন বাবা পাখা খানি হাতে করিয়া নিজেকে বাতাস করিতে করিতে বাহিরের প্রকোষ্ঠে যাইয়া বড় একটা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতেন।

মানিকগঞ্জে আসার পর হইতে বাবার পশার খুব বৃদ্ধি হইল। তিনি সেখানকার শ্রেষ্ঠ উকিল হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং গভর্ণমেণ্টের উকীল রূপে মানোনীত হইলেন। সে সময় খুব সুখেই গিয়াছে। মানিকগঞ্জে তখন দুধের সের দুই পয়সা। সাধারণতঃ মুসলমানেরাই দুধ বিক্রয় করিত। দুধে জল দেওয়ার পদ্ধতি তখনও প্রচলিত হয় নাই। মুসলমানেরা হিন্দুর জাতি বিচার মানিয়া দুধে জল মেশান পাপের কার্য্য বলিয়া মনে করিত। মাছ খুবই সস্তা ছিল। আমাদের বাসায় রোজ একমণ খাটি দুধ আসিত, তাহার দাম এক টাকার কাছাকাছি ছিল। বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী দিগ্বসনী দেবী দুধের পুরু সর ঘিয়ে ভাজিয়া রাখিতেন। তিনি বৃন্দাবন, কাশী প্রভৃতি অঞ্চল বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক জায়গা হইতেই কোননা কোন মেঠাই তৈরী করার প্রণালী শিখিয়া আসিয়া ছিলেন,—তাঁহার হাতের বরফীর মত বরফী আমি খাই নাই। তাছাড়া

'বকুল-চাকি', এবং নানা প্রকারের মালপো তৈরি করায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নারিকেল ও দুধ দিয়া যে তিনি কতরূপ মেঠাই তৈরী করিতে পারিতেন, তা আর কি বলিব? তাঁহার মত নারিকেলের সূক্ষ্ম চিঁড়ে জিরে প্রস্তুত করিতে সে অঞ্চলে কেহ জানিত না। তিনি নারিকেল ও দুধ দিয়া মাছ, ময়ুর, গাছ,—তার ডালে ডালে ফুল ও পাখী বসিয়া আছে,—পদ্ম প্রভৃতি কতরকম জিনিষ যে তৈরি করিতে পারিতেন, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। সেগুলি মর্ম্মর-গঠিত মূর্ত্তির ন্যায় কোন কোনটি সাদা ধব্‌ধবে্ করিয়া রচনা করিতেন, কোন গুলি বা নানা বিচিত্রবর্ণে—লাল, নীল, কালোর সু নপুন চিত্রনে—সখের খেলনার মত দেখাইত। একবার বাবার বন্ধু একটি মুন্সেফ (কালিকাতার অঞ্চলের) আমাদের সঙ্গে অনেকদিন ধরিয়া মিষ্টদ্রব্য উপহারের পাল্লা দিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহিণী ভাল মেঠাই তৈরী করিতে পারিতেন। তাঁহাদের বাড়ী হইতে আমাদের বাড়ীতে উপহার আসিত, এবং আমারা ও তাহার প্রতিদান পাঠাইতাম। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার হার হইয়া গেল, দিদিমার দিগ্বিজয়ী হাতের কাছে কোন ময়রার সাধ্য ছিলনা দাঁড়ার, অপরের কিকথা! তিনি এক একদিন শুধু কাশীর মেঠাই চালাইতেন, চম্ চম্ দিয়া চমকাইয়া ফেলিতেন; কখনও বা বৃন্দাবনে পেঁড়া, বরফির বহর চালাইতেন। কিন্তু যখন তিনি নারিকেল ও দুধ দিয়া কারুকার্য্য করিতেন, তখন ত ইটালির ভাস্কর ও কৃষ্ণনগরের কুমার তাহার কাছে হার মানিয়া যাইত।

নিরামিশ রান্না যে তিনি কতরূপ রাঁধিতে জানিতেন, তাহা আর কি বলিব? সেরূপ রুচিকর জিহ্বার পরমসম্পদ আর কোথায় পাইব? মানিকগঞ্জের মাছ খুব সস্তা ছিল, কিন্তু সুয়াপুরে আরো সস্তা ছিল। সুয়াপুরের নিকটবর্ত্তী রঘুনাথ-পুরের প্রকাণ্ড বিলে জেলেরা এক অদ্ভুত উপায়ে মাছ

ধরিত। বড় একটা নৌকার গলুইএর উপর তারা দাঁড় দিয়া ঠক্ঠক্ একরূপ শব্দ করিত, অমনই চারদিক হইতে লাফাইয়া মাছ আসিয়া নৌকায় পড়িত। সেই মাছ সংগ্রহের এক বিপদ ছিল,—বড়বড় মাছ জেলের ঘাড়ে পড়িয়া অনেক সময় জেলেকে একবারে ঘাল করিয়া ফেলিত, তাদের কখনও কখনও ঐরূপ আঘাতে হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। খুরাপুর বসিয়া ।• আনা কি ।/• আনা মূল্যে একটী প্রকাণ্ড রুই, (প্রায় ১৪।১৫ সের ওজনের) আমরা ক্রয় করিয়াছি। সাধারণত দুই তিন পয়সায় মাছ চাহিলে জেলে ছোট ছোট মাছে বড় একটী খালুই ভর্ত্তি করিয়া দিত, মাজারি রকমের একটি পরিবার তাহা খাইয়া সাবাড় করিতে পারিত না। তৈলের সের ছিল ।/৩ আনা ; ঘি বার আনা (উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘি) আমাদের বাড়ীতে সাধারণত ঘি কেনা হইত না, দুধের সর অনেক দিন সঞ্চয় করিয়া তাহা বাটিয়া ঘি করা হইত,তাহার সুমিষ্ট ঘ্রাণে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিত। এখন রাজা মহারাজারা যেরূপ খাইতে পান না (ভেজালের যন্ত্রনায় টাকা থাকিলে ও ভাল খাদ্য জোটেনা) তখন যে সাধারণ গৃহস্থ সেরূপ আহারে পরিতৃপ্ত হইতেন। সেই দুধের ঘিয়ের স্বরাজ্যে আমাদের ছেলেরা শুকাইয়া মরিতেছে, জোলো দুধের কয়েক চামচ এবং ভেজাল ঘিয়ের ছিটা ফোঁটা তাহাদের ভাগ্যে জুটিতেছে না। অনেক সময় হরলিক কিম্বা এলেনবাড়ী দিয়া 'দুধক পিয়াস' ঘোলে মিটাইতে হইতেছে।

আমার ছোটবেলাটা খুব আদরেই কাটিয়াছে। খেলার সাথীদের মধ্যে কেউ কেউ প্রায়ই আমাকে 'আদুরে ছেলে' বলে খেপাইত। অতি শিশুবয়সে বাড়ীতে অত্যন্ত দুষ্টামি করিয়া পিতামাতার প্রশ্রয় পাইয়াছি, এমন কি আমার ৪।৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শুধু আমাকে দেখিবার জন্য দুইটি চাকর নিযুক্ত ছিল। লক্ষ্মী নাম্নী পরিচারিকার ক্রোড় হইতে নামিয়া যখন আমি হামাগুড়ি দিতে শিখিলাম, সেই সময় হইতে আমার

জন্য সেই দুইটি চাকর নিযুক্ত ছিল। তার মধ্যে আমাদের গ্রামের রাম-দুর্লভ সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র কোকাসিংহের কাজ ছিল—আমার মার ধর সহ্য করা। আমি রাগিয়া গেলে তাহার উপর উৎপাত করিতাম এবং তা' তাকে সহ্য করিতে হইত। তাহার গায়ের চামড়ার উপর দাঁত বসাইয়া রক্ত বাহির করিয়া, তাহারই কাঁধে চড়িয়া, তাহার মাথার চুল ছিঁড়িতাম, সে একবারে নিত্যানন্দমহাপ্রভুর মত, "মেরেছে কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না" এই নীতির অনুসরণ করিয়া আমার মার ধর্ সহ্য করিয়া আদর করিতে থাকিত। এই মার ধর্ করার স্বভাবটা আমার ৮।৯ বছর পর্য্যন্ত ছিল। আমার পরে মায়ের আরো দুইটি মেয়ে হইয়াছিল, তাহাদের একজনের নাম ছিল মৃন্ময়ী ও অপরের নাম ছিল কাদম্বিনী,—ফটোগ্রাফ নাই, তা না হইলে দেখাইতে পারিতাম মৃন্ময়ীর ডাগর চোখ-দুটির কি স্নিগ্ধ মহিমাময় মাধুর্য্য ছিল এবং পাতলা ঠোঁট দুখানিতে কি মন ভুলানো হাসি ফুটিয়া উঠিত। কাদম্বিনীর কাল চুলে যেন সত্যই মেঘের লহর ছড়াইয়া পড়িত। এই দুই ভগিনী যে আমার হাতে কত মার ধর খাইয়াছে তাহা আর কি বলিব! বড় হইয়া সেই অপরাধের অনুতাপে আমি কতরাত্রি বিছানায় শুইয়া শুইয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছি। ইহারা আমার হাতের মার ধর খাইয়া কিছু বলিত না, কারণ সেই বাড়ীর একছত্র ক্ষুদ্রসম্রাট আমিই ছিলাম—বহু ভগিনীর মধ্যে একমাত্র পুত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাঞ্ছিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলাম। তাহারা জানিত, তাহা-দের দাদার এই অধিকার ভগবানই দিয়াছেন। কিন্তু আমার মা আমাকে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসিলেও আমার এই সকল অত্যাচারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যেরূপ চক্ষের ভঙ্গীতে আমার প্রতি চাহিতেন, তাহাতে আমি ভয়ে কেঁচো হইয়া যাইতাম। কিন্তু আমার চক্ষে জল দেখিলে তিনি আমায় কোলে করিয়া চুমো খাইতেন। আমার মার-ধরের চিহ্ন বা স্মৃতি এখনও সুয়াপুর

গ্রামের একটি লোক বহন করিতেছে। সে হচ্ছে, আমার বাল্যকালের খেলার সাথী বনবিহারী সাহা, তাহার হাতে একটা দাগ এখনও আছে, আমি সেইখানে তাহাকে একটা ছুরি দিয়া আঘাত করিয়াছিলাম। সে সেইটি দেখাইয়া এখনও স্নেহের গৌরব করিয়া থাকে। আমি জন্ম হইতেই এত দূর আদুরে হইয়াছিলাম, যে আমার সঙ্গে যে যমজ ভগিনী হইয়াছিল, তাহাকে "বাঁদী" নাম দেওয়া ছিল। সে এখনও জীবিত আছে, চিরকালের অভ্যাসবশতঃ এখনও "বাঁদী" নামই মুখে আইসে, কিন্তু এই ভাবে ডাকার দরুণ তাহার স্বামী আমার নিকট একদিন বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমি বাড়ীতে দৌরাত্ম্য করিতাম, কিন্তু বাহিরে গো-বেচারি ছিলাম। আদুরে ছেলে বলিয়া কথায় কথায় আমার সহচর বন্ধুরা আমায় ঠাট্টা করিত। দুর্ব্বল ছিলাম বলিয়া যে সে আমার চড়-থাপড় মারিয়া যাইত—আমি তাহা কাহাকেও বলিতাম না। সেই সময়ে দুএকটি অশ্রু চোখের কোণে দেখা যাইত, তা এক হাতে মুছিয়া ফেলিতাম।

(৬)

শিক্ষা দীক্ষা।

পাঁচ বছর বয়সে যথারীতি হাতেখড়ি হওয়ার পর, আমি সুয়াপুর গ্রামে বিশ্বম্ভর সাহার পাঠশালায় লেখাপড়া করিতে সুরু করিয়া দেই। ইহার পূর্ব্বেই আমি রামায়ণের অনেকটা মুখস্থ বলিতে পারিতাম। অক্ষর পরিচয় হওয়ার পূর্ব্বেই আমার সেটি হইয়াছিল। দিগম্বরী দেবী শুধু মিষ্টান্ন প্রস্তুত করায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এমন নহে। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গলায় সুপণ্ডিতা ছিলেন। বৈষ্ণব-পরিবারে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল – সুতরাং তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণব বন্দনা প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ ছিল। সাঁঝের দীপ জ্বালিয়া শীতকালে ঘরের মধ্যে একটা আগুন করিয়া আমরা বসিয়া যাইতাম। তিনি ঐ সকল পুস্তক সুর করিয়া পড়িয়া যাইতেন। তাঁর সুর কি মিষ্ট ছিল.! এখনও আমার কাণে তাহার রেস জাগিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যাঁহার সুর এরূপ মিশ্রির মত মিষ্ট ছিল, রাগিয়া গেলে তাঁহার সুর এমন রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ হইত যে তাহাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কর্ণ ভেদ করিয়া মর্ম্মস্পর্শ করিত। তিনি পুঁতির নানারূপ ছড়ি ও খেলনা প্রস্তুত করিতে পারিতেন; তা ছাড়া জরির সুতো দিয়া রুমালের উপর নানারূপ কারুকার্য্য প্রদর্শন করিতেন।

রামায়ণ ও মহাভারত সাধারণত পড়া হইত। আমার মনে আছে অন্ধকার রাত্রি। ঘরের বাহিরে কালো শাড়ী পড়িয়া অমাবস্যা নিঝুম হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের ঘরের সেই আগুনের দুই একটি